বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

প্রথম বর্ষ■সংখ্যা - ৩■জুলাই ২০১১

◆প্রাচীন লিপি
◆শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান (ধারাবাহিক)
◆বন্যা এবং বহুমুখী নদী প্রকল্প
■বলির পাঁঠা
■তরমুজের স্বাদ নোনতা

■কবিতা■চিঠিপত্র■রিপোর্ট

সম্পাদকীয়

১

দেখতে দেখতে 'সমীক্ষণ'-এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। 'সমীক্ষণ'-এর মতো পত্রিকার প্রকাশনা নির্ভর করে পাঠক, শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার অন্তর্বর্তী সময়ে পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আরও কাছে আসতে সক্ষম হয়েছে সমীক্ষণ। এর কারণ পত্রিকার গণ চরিত্র। পত্রিকার গণচরিত্র আরও বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার রয়েছে আমাদের। এ জন্য পত্রিকাকে মানুষের সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তার বৈজ্ঞানিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। আর এই কাজ যেহেতু সমাজ সভ্যতাকে ব্যাতিরেকে হতে পারে না তাই প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই 'সমীক্ষণ' সমস্ত বিজ্ঞান মনস্ক মানুষজন এবং প্রতিটি বিজ্ঞান সংগঠনের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে সর্বব্যাপী বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এইভাবেই সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে বিজ্ঞানের সুফল পৌঁছে দেওয়ার সম্ভব।

গত সংখ্যার 'সমীক্ষণ'-এ বিভিন্ন রচনার বিষয়ে কিছু পাঠক তাদের অমূল্য মতামত দিয়ে সমীক্ষণকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা রেখেছেন যা এই অবকাশে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কিছু পাঠক 'সমীক্ষণ'-এ ছোটদের জন্য পৃথক কলাম রাখার কথা বলেছেন। এ দাবী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বাস্তবিক, ছোটদের জন্য বিজ্ঞান পত্রিকা তো দূরের কথা জ্ঞানের যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারে এমন পত্রিকাই বা কোথায়? স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক এই চাহিদা মেটাতে অক্ষম। তাই এই দাবী। উত্তরে বলা দরকার 'সমীক্ষণ' এ বিষয়ে খুবই সজাগ এবং ছোটদের মননের বিকাশকে খুবই গুরুত্বসহকারে ভাবে। ছোটদের জন্য পৃথক কলাম নয় বরং ছোটদের জন্য পৃথক কলাম নয় বরং ছোটদের জন্য পৃথক বিজ্ঞান পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সমীক্ষণ। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতিতে তা আপাততঃ সম্ভব নয় তাই আগামী সংখ্যাগুলিতে ছোটদের জন্য উপযোগী রচনার কথা 'সমীক্ষণ' গুরুত্ব সহকারে ভাববে। এ বিষয়ে পত্রিকা পাঠকদের সহযোগীতা আশা করে।

গত সংখ্যায় 'খাদ্য সংকট ও বেকারত্বের কারণ কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি' শীর্ষক রচনাটি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও চীনের প্রসঙ্গটি কেন আলোচনার বাইরে রাখা হল সে বিষয়ে কয়েকজন পাঠক জানতে চেয়েছেন। এটা জানতে চাওয়ার পিছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে তা হল যেহেতু চিন একটি জনবহুল দেশ এবং আলোচনার বিষয়বস্তুও জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাই পাঠকদের কৌতুহল। উত্তরে বলা যায় রচনাটি কোনও নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক নয় বরং পৃথিবীব্যাপী সমস্যার কথা মাথায় রেখেই রচিত। রচনার মূল বিষয়টিকে আরও যুক্তিপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে যেখানে পৃথিবীর মাত্র দশটি দেশের কথা উল্লিখিত আছে। পরিসংখ্যানের সূত্র গুলিও রচনায় উল্লেখ করা আছে উৎসাহী পাঠক ঐ সূত্রে পৃথিবীর সব কটি দেশের পরিসংখ্যান-ই পেয়ে যাবেন। রচনায় চীন বা অবশিষ্ট সব কটি দেশের পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ থাকলেও রচনার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হবে না।

কতিপয় পাঠক 'রাজীব দাসের মৃত্যু – একটি ময়না তদন্ত' শীর্ষক রচনাটি বিজ্ঞান পত্রিকায় কেন স্থান পেল সেই প্রশ্ন রেখেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে রচনাটি কোনও বাজারী সংবাদ পত্রের নিছক প্রতিবেদন নয়। বরং সমাজে ঘটে চলা নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, ইভটিজিং ইত্যাদির কারণ সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে রিঙ্কু দাসের উপর নিগ্রহ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য তার ভাই রাজীব দাসের খুন কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমন শত শত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে এবং চলবে যতদিন না বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস হয়ে নারী-পুরুষের সম মর্যাদাদায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। এমনই সমাজে তথা প্রকৃতিতে ঘটে চলা প্রতিটি ঘটনার পিছনে কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে এবং বস্তুগত কারণ রয়েছে। সেই কারণগুলি বিশ্লেষণ করা এবং তার প্রতিকার নির্দিষ্ট করা অবশ্যই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তাই এমন রচনা আগামী সংখ্যাগুলিতেও থাকবে।

সর্বোপরি, একজন পাঠক গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাপের সাতকাহন' ও 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' রচনা দুটির উপর তাঁর মতামত জানিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছেন। ঐ পাঠককে সমীক্ষণের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই। পাঠকদের কাছ থেকে এমন উদ্যোগ সমীক্ষণ আশা করে। চিঠিটি এবং তার উত্তর এই সংখ্যায় পৃথকভাবে মুদ্রিত হল। ■

২

ইদানিং পরিবেশ নিয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর আলোচনা চলছে। একদিকে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন এন জি ও যেমন নিরলসভাবে মানুষকে তাদের মতো করে শিক্ষিত করতে চাইছে, অন্য দিকে স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকেও পরিবেশবিদ্যাটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পৌরসংস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাও এই মহাযজ্ঞে সামিল হয়েছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে সমস্ত বিশ্বের পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্র (বায়োডাইভারসিটি) আজ বিপন্ন। বিপন্ন মনুষ্য কার্যকলাপের (অ্যানথ্রোপোজেনিক) কারণে। এর সূত্রপাত শিল্প বিপ্লবের যুগ হতে। ঐ সময় হতে কল-কারখানা অত্যধিক জ্বালানী ব্যবহারের কারণে পরিবেশে গ্রীণ হাউস গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ফলে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় যা মেরু অঞ্চলে ও পর্বত চূড়ায় জমে থাকা বরফ গলিয়ে সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি করছে। এভাবে চলতে থাকলে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে – পৃথিবীর ব্যাপক স্থলভাগ জলের তলায় চলে যাবে। মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য জীবজন্তু, উদ্ভিদ তথা বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হবে। রাষ্ট্র সংঘ দ্বারা পরিচালিত (জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সংস্থা) আই পি সি সি তার বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং এই তথ্য বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে। এই সংস্থা আই পি সি সি, নোবেল পুরস্কার জয় করার পর এই তত্ত্বের মান্যতা আদায় করে নিতে অনেকাংশে সফল হয়েছে। যদিও এই তত্ত্বের এবং ভবিষ্যতবাণীর বিপরীত মতামতও রয়েছে। এই তত্ত্বের পক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন কোনটাই কোনও স্থির বৈজ্ঞানিক গবেষণাভিত্তিক ফলাফলের উপর দাঁড়িয়ে নেই। বরং কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছনোর তাড়নায় তথ্যগুলিকে সেই মতো সাজানো হচ্ছে যেমন বিশ্ব উষ্ণায়নের পিছনে মহাজাতিক কোনও কারণ তারা খুঁজে পায়নি বরং সেই কারণ ঢেকে দেবার জন্য মনুষ্য কার্যকলাপ জনিত কারণকে প্রধান করে দেখানো হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও শীতলায়ন যে একটি প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ঘটনা তা আড়াল করা হয়েছে। বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটলে তা মুনষ্যকার্যকলাপ জনিত বলা হচ্ছে কিন্তু গড় তাপমাত্রা হ্রাস ঘটলে (১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রা হ্রাস পায়) তার জন্য অন্য যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে। পরিবেশে সত্যই এই পরিবর্তন ঘটছে কিনা তা জানার জন্য যে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন সেই গবেষণা বাস্তবিক হচ্ছে না। কারণ, সঠিক বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে স্থির বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার ব্যয়ভার গ্রহণ করবে কোন দেশ? যেহেতু পরিবেশ কোন নির্দিষ্ট দেশীয় গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই বিষয়টি আন্তর্জাতিক। উপরন্তু এই গবেষণা থেকে আয়োজকদের মুনাফা সৃষ্টি হবে না। তাই তারা বেশ কিছু মুনাফা সৃষ্টি কারী নিদান দিলেন। যেমন পার্সোনাল কম্পিউটারের বদলে ল্যাপটপ্, টাংস্টেন বাল্বের বদলে সিএফএল, ফসিল ফুয়েল ব্যবহার কমিয়ে অন্য জ্বালানী ব্যবহার করা, বিদ্যুৎশক্তি কম খরচ করে এমন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, ওয়েবসাইট থেকে ই-মেল করা ইত্যাদি হাজারো নিদান। সর্বোপরি, পরিবেশগত স্টান্ডার্ড মেনে চলে এমন কোম্পানীর মাল খরিদ করার নিদান দেওয়া হচ্ছে পরিবেশকে বাঁচানোর জন্য। এ যেন পরিবেশ রক্ষার নামে বহুজাতিক কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। তাই বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের প্রশ্ন, পরিবেশ রক্ষার নাম করে যারা মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে পরিবেশ তথা বিজ্ঞান কি তাদের হাতে নিরাপদ?■

বিজ্ঞান মনস্ক গ্রামে বা শহরে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকারী অনুষ্ঠান করে থাকে। আপনার এলাকায় কুসংস্কার বা সামাজিক অন্যায়ের ঘটনা ঘটলে আমরা তার স্বরূপ উদ্ঘাটন, অন্যায় দূর করার কাজে সহযোগিতা করে থাকি।

যোগাযোগের ঠিকানা

নন্দা মুখার্জী ঃ ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, ফোন - ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫

Email : samikshan2009@gmail.com

পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ ও সমাধান

বিগত শতাব্দীর সাতের দশক থেকে বিশ্ব পরিচালক, বিশ্ব পরিচালক সংস্থাগুলি এক অংশের পক্ষ থেকে বিশ্বের পরিবেশ পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এঁদের মতে পরিবেশের এই পরিবর্তনের কারণ এককথায় শিল্প ও সভ্যতার বিকাশ অর্থাৎ মনুষ্যজনিত ক্রিয়াকলাপ।

পরিবেশের পরিবর্তন বলতে কি বোঝান হয়েছে? পরিবেশের পরিবর্তন বলতে বোঝান হয়েছে শিল্প-কারখানা স্থাপন, বনভূমি হ্রাস, যানবাহনের ব্যবহারের ফলে পরিবেশে কার্বনডাই অক্সাইড-এর পরিমাণবৃদ্ধি, অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস, পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি যার ফলস্বরূপ গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

মানুষ কর্তৃক পরিবেশ দূষণ মোকাবিলার জন্য ১৯৭২ সালে স্টকহোমে রাষ্ট্র সংঘের মানব পরিবেশ বিষয়ে প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ঠিক হয়েছিল, প্রতি বছর ৫ই জুন-কে "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" রূপে পালন করা হবে। এতে মানুষ পরিবেশ রক্ষায় যত্নবান হবে, পরিবেশ দূষণ ঘটবে না, পরিবেশ স্থিতিশীল থাকবে।

১৯৮৫ সালে অস্ট্রিয়াতে "কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রীণ হাউস গ্যাসের প্রভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ও সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন" শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের পরে বিভিন্ন পরিবেশবাদী গ্রুপ, "গ্রীণ পার্টি", "গ্রীণ লবি" – জনসাধারণের মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিতর্কটি নিয়ে আসে এবং পরিবেশবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণে আন্তর্জাতিক চুক্তি সাক্ষরিত হয় তথা রাষ্ট্রের আইনে তা স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলস্বরূপ ১৯৮৮তে রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা একটি বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই পি সি সি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইম্যাট চেঞ্জ) গঠিত হয়।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিতে, রাষ্ট্র সংঘের দ্বিতীয় পরিবেশ সম্মেলন, "বসুন্ধরা সম্মেলন" (আর্থ সামিট)-এইউ এন এফ সি সি (ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইম্যাট চেঞ্জ) চুক্তি সাক্ষরিত হয়। যদিও উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির

মধ্যে মতবিরোধ থাকার জন্য এতে কোন বাধ্যতামূলক আইন রাখা হয় নি। রাষ্ট্রসংঘ, সদস্য রাষ্ট্রের সরকারগুরিকে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির বিষয়ে এমনভাবে পুনর্বিবেচনা করতে বলে যাতে পুনঃনবীকরণ যোগ্য নয় এমন সম্পদের ধ্বংস ও পৃথিবীর দূষণ রোধ করা যায়। এই চুক্তিতে বলা হয় উন্নত রাষ্ট্রগুলি তাদের গ্রীণহাউস গ্যাস নির্গমন ১৯৯০ সালে যতটা হত সেই মাত্রায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলির কোনও দায়িত্ব থাকবে না। ফসিল ফুয়েলের পরিবর্তে অন্য কোনও শক্তির উৎস ব্যবহার করা হবে। নির্গত দূষণের পরিমাণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সাধারণের জন্য নতুন ধরণের যানবাহন চালু করা হবে। জলসংকটের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হবে। ১৯৯৪ সালে ৫০ টি দেশ এই চুক্তিতে সম্মতি দেয়। রাষ্ট্র সংঘের নিয়মানুযায়ী চুক্তিটি কার্যকর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে সম্মতি দেয় নি। ঠিক হয় সাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি প্রতিবছর একবার করে মিলিত হবে একটি সম্মেলনে, যার নাম দেওয়া হয় 'কপ' বা সি ও পি (কনফারেন্স অফ দ্য পারটিজ)। ১৯৯৫ সালে বার্লিনে 'কপ'-এর প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯৯৭তে জাপানের কিয়োটোতে 'কপ'-এর তৃতীয় অধিবেশন 'কিয়োটো প্রোটোকল' নামে পরিচিত। এই অধিবেশনে বলা হয় শিল্পোন্নত দেশগুলি অবশ্যই ১৯৯০ সালে যা কার্বন নির্গমণ করত গড়ে তার ৫.২% কমাবে। 'কিয়োটো প্রোটোকল' নতুন দুটি লাভজনক ব্যবসা – "কার্বন বাণিজ্য" ও "বনসৃজন" ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়, যা আগে কখনো হয় নি।

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে 'কপ'-এর সভায় ঠিক হয় ২০০৯-এর কোপেন হেগেন সভায় ২০১২ এবং তার পরবর্তী সময়ের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ২০০৯-এর কোপেন হেগেন সম্মেলনও পূর্বের সম্মেলনগুলির মতই কোনও আইনী বাধ্য বাধকতা ও আন্তর্জাতিক নজরদারি না রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে।

পরিবেশ সম্পর্কে জনতাকে সচেতন করতে যে প্রচারগুলি সামনে উঠে এসেছে সেগুলি হল ঃ (১) শিল্প-কারখানায়, শক্তি উৎপাদনে, যানবাহনে ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার, বনজঙ্গল কেটে শিল্প স্থাপন, নগরায়ন, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, রঙ, ফোম, প্লাস্টিক প্রস্তুতি ও ব্যবহারের ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ইত্যাদি যৌগগুলির আনুপাতিক পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা হচ্ছে **বায়ুদূষণ**। গ্রীণ হাউস গ্যাসবৃদ্ধির জন্য "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" ঘটছে, জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে, শহর ও শিল্পাঞ্চলে ধোঁয়াশা ও অম্লবৃষ্টি হচ্ছে। মানবদেহে নানাপ্রকার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। ইট, পাথর, চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতির ক্ষয়সাধন ঘটছে।

(২) শিল্প-কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত তরল বর্জ্য পদার্থ নদী-নালায় সরাসরি ফেলা হচ্ছে। যার মধ্যে ফেনল, সায়ানাইড, অ্যামোনিয়া, সীসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক-এর মতো মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থ থাকে। পয়ঃপ্রণালীর আবর্জনা, শস্যক্ষেত্রের কীটনাশক, আগাছা নাশক, মাটি এবং মাটি ধোঁয়া বৃষ্টির জলের মাধ্যমে জলাশয়গুলিতে পৌঁছায়। ফলে মাটি ও জল দুই-ই দূষিত হয়। তেজস্ক্রিয় চুল্লীর আবর্জনা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করার ফলেও দূষণ ঘটে। আর্সেনাইট জাতীয় কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কৃত্রিমভাবে আর্সেনিক দ্বারা জলদূষণ ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে পরিবেশ দূষণ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি থাকলেও পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বৈঠকগুলির রিপোর্টে তেজস্ক্রিয় দূষণ সম্পর্কে নীরব থাকা হয়েছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' একটি প্রাকৃতিক ঘটনা।

যাই হোক প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আন্তর্জাতিকভাবে দেশীয়স্তরে কতগুলি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল ঃ–

(ক) কার্বন বাণিজ্য

(খ) বনসৃজন প্রকল্প

(গ) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন কুঞ্চন বাতায়ন (ক্র্যাঙ্কেজ ভেনটিলেশন), ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, স্থির তড়িৎ অধঃক্ষেপণ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে দূষণ রোধ করা।

(ঘ) বিশুদ্ধ জল পান করতে জল শুদ্ধিকরণ যন্ত্রের ব্যবহার।

(ঙ) পলিপ্যাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

এটা লক্ষ্যণীয় যে পরিবেশ দূষণ নিয়ে সবরকম প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে দূষণের দায় যেমন চাপানো হয়েছে প্রকৃতি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার অপসারণের উপর, তেমনি পরোক্ষভাবে চাপানো হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বভাব ও অভ্যাসের উপর। এই প্রচারগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ – নিজেরাই প্রচারমাধ্যমে পরিণত হয়েছেন। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই প্রচার নির্বিচারে মেনে নেওয়াই এখন সমাজের রীতি।

পরিবেশের স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে যে যে উপায় ও সমস্যাগুলি উঠে এসেছে সেগুলির স্বরূপ ও সমাধান সম্পর্কে

এখন চর্চা করা যাক।

(ক) কার্বন বাণিজ্য

'কার্বন বাণিজ্য' প্রকৃতপক্ষে দেশে কার্বন নির্গমণ বাধ্যতামূলকভাবে হ্রাস করার পরিবর্তে একটি বাজারী পদ্ধতি চালু করা, যা টাকার বিনিময়ে কার্বন নির্গমণ বিষয়টি শিল্পপতি তথা পুঁজিপতির পছন্দ-অপছন্দের উপর দাঁড় করায়। 'কার্বন বাণিজ্য' তত্ত্বগতভাবে সামান্য অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত মাত্রায় কার্বন নির্গমণের স্বীকৃত অধিকার। কার্বন বাণিজ্যের বাজার কত বড় তা এক্ষুণি বলা সম্ভব নয়, কারণ – এটি নতুন পণ্য, এই বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সহজলভ্য নয়, তাছাড়া এ ব্যবসায় বিভিন্ন স্কীম চালু আছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক কার্বন বাণিজ্যের (কার্বন ফিন্যান্সিং)-এর প্রধান অংশীদার। বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর মতে গরীব ও উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতির মাধ্যমে 'কার্বন বাণিজ্য'-এর বাজার ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। কার্বন বাণিজ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর নিজস্ব ফিনান্স ফান্ড ২০০৪-এর ৪১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৯১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রোটোকলে সম্মতি না দিলেও, আঞ্চলিকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কার্বন বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিয়োটো প্রোটোকলে "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম" (সি ডি এম) অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলি কার্বন নির্গমণ বৃদ্ধি করতে পারে, উন্নয়নশীল, দেশগুলি থেকে টাকার বিনিময়ে কার্বন নির্গমণ কিনে, 'কার্বন' – পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে, কার্বন নির্গমণ হ্রাস করা যায় কি? এখানে বাণিজ্যিক সংস্থা, দালাল ও ব্যাঙ্কগুলি কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে কমিশনের দ্বারা উপার্জন আশা করছে। 'সি ডি এম' পলিসি প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিল্প বিকাশের পরিপন্থী।

(খ) বনসৃজন প্রকল্প

'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান' –এই স্লোগান যে অর্থ ব্যক্ত করে, তাতে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, যে কোন উদ্ভিদ দৈনিক শ্বসন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে ত্যাগ করে, তার থেকে বেশী মাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে শোষণ করে। কিন্তু এই যুক্তির কোনও প্রমাণ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। উদ্ভিদ কেবলমাত্র দিনের বেলায় ফোটোলাইলিস প্রক্রিয়ায় (সালোক সংশ্লেষের আলোক দশায়) জল বিশ্লেষণ করে অক্সিজেন উৎপন্ন করে, কিন্তু দিন-রাত সব সময়ই শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড বর্জন করে, আবার বছরের সব সময় দিন ও রাতের সময়ের পরিমাণ কমে-বাড়ে। বায়ুমন্ডল সৃষ্টির সময় বাতাসে অক্সিজেন ছিল না। তাই সেই সময় অবাত শ্বসনকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্ম হয়েছিল। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের উপস্থিতির পরেই সবাত শ্বসনকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে আজও বহু অবাত শ্বসনকারী জীবের অস্তিত্ব আছে। এসব কিছুর হিসাব করে কি 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান' আওয়াজ উঠেছে! এছাড়া পৃথিবীর উদ্ভিদকূল শুধুমাত্র বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনই মুক্ত করে না, বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় ভূগর্ভস্থ জলকে বাষ্পে পরিণত করে পরিবেশের জলীয় বাষ্পও (যা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রীণ হাউস গ্যাস) বৃদ্ধি করে।

আসলে বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে শাল, সেগুন, রাবার, মেহগনী, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি বাণিজ্যিক গাছের বনভূমি সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে অনেক ছোট-বড় কোম্পানী, মাফিয়া চক্র, প্রশাসন-নেতা মন্ত্রীরা বিরাট মুনাফা কামাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে পৃথিবীর কৃত্রিম বনসৃজন প্রকল্পগুলির অধিকাংশই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই দেখা যায়, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নয়।

(গ) গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বা 'বিশ্ব উষ্ণাযন' একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রোটেরোজোয়িক যুগের (অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে) পর থেকে পৃথিবী পর্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ হয়েছে। কারণ সেই সময় থেকে পৃথিবীর তাপচক্রে তাপের প্রধান উৎসরূপে শুধুমাত্র (বা প্রধানত) সূর্যই অবস্থান করছে। পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সব সময় স্থির নয়, পর্যায়ক্রমে এই দূরত্ব বাড়ে ও কমে। পৃথিবী ও সূর্যের সংযোগকারী তলের অবস্থানের পরিবর্তন এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের সরল দোলগতির জন্য তাপের উৎস সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান সময় সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এই সকল মহাজাগতিক কারণে পর্যায়ক্রমে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বাড়ে ও কমে, অর্থাৎ 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' ও 'গ্লোবাল কুলিং' (যা তুষার যুগের সৃষ্টি করে) ঘটে। বর্তমানে আমরা দুটি তুষার যুগের মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছি। এই মহাজাগতিক কারণ ছাড়াও প্লেট টেকটনিক [পৃথিবীর উপরিতলের লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট-(সামুদ্রিক ও মহাদেশীয়)গুলির সরণের জন্য] কারণে এবং বায়ুমণ্ডলীয় কারণেও (যেমন গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলির মাত্রার পরিবর্তন) বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং শীতলায়ন হয়। যদিও মহাজাগতিক কারণের কাছে অপর দুটি কারণ তুচ্ছ। গ্রীণ হাউস গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হল জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন। এগুলির পরিমাণও প্রধানভাবে পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবেই বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়।

সাইবেরিয়ায়, প্রায় ২ মাইল বরফের নীচে আবদ্ধ বায়ুর বুদবুদ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে সময় ঐ তুষারপাত হয়েছিল (প্লাইসটোসিন যুগে) তখন বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ

স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী ছিল। এই তথ্য প্রমাণ করে যে মনুষ্যজনিত কারণেই শুধুমাত্র বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে এই তথ্য সঠিক নয়।

আবার পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে তা হলে কোনটি কারণ আর কোনটি ফল?

(ঘ) অ্যাসিড বা অম্ল বৃষ্টি

নাইট্রোজেন চক্র ও সালফার চক্রের মধ্যে এক একটি পর্যায় নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রাস অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী হয় এবং তা বৃষ্টির সাথে মাটিতে নেমে আসে। আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্‌গত ধোঁয়া, বজ্রপাতের কারণে বায়ুর সালফার ও নাইট্রোজেন-অক্সাইড যৌগে পরিণত হয়। এই আম্লিক অক্সাইড যৌগগুলি বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষার-এর সঙ্গে অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার সময় দ্রবণে পি এইচ-এর মান যদি ৭এর কম হয় (বিশেষতঃ ১-৪-এর মধ্যে হয়) তবে তাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলে। সুতরাং অ্যাসিড বৃষ্টি জৈব-রাসায়নিক চক্রের অংশ, ভিন্ন কিছু নয়।

এই অম্লবৃষ্টির জন্য শুধু প্রাকৃতিক কারণ দায়ী নয়।

শিল্পীয় উৎপাদন ও যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশে সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পেলে অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ১৯৭৯তে কানাডার টরেন্টোয় অ্যাসিড বৃষ্টি (পি এইচ – ৩.৫), ১৯৮১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে (পি এইচ – ২.২), ১৯৮১ সালে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় (পি এইচ – ১.৪) অ্যাসিড বৃষ্টি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অম্ল বা অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য পি এইচ-এর মান ৪ এর নীচে নেমে গেল জলাশয়ের সকল সজীব উপাদান মারা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় অ্যাসিড বৃষ্টিকে তাই "হ্রদ হন্তারক" বা লেক কিলার বলা হয়।

কিন্তু এই অম্ল বা অ্যাসিড বৃষ্টি কি পরিবেশের তথা মানবসমাজের শুধুই ক্ষতি করে? এই অ্যাসিড বৃষ্টি না হলে মাটিতে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগের পরিমাণ কমে যেত এবং তা মটরজাতীয় নানা উদ্ভিদ চাষে প্রচুর ক্ষতি করত।

একথাও আমাদের মাথায় রাখা দরকার যে অ্যাসিড বৃষ্টি বা পরিবেশের অম্লতা বৃদ্ধি শিল্প বিকাশের পরেই হয়েছে একথা সত্যি নয়। পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার প্রমাণ পাথরের গায়ে প্রমাণ হিসাবে রয়ে গেছে এবং বনভূমি থেকে কয়লা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবেশে অম্লতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

(ঙ) জল সংকট

ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলন করতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা পুনর্নবীকরণ যোগ্য নয় – এই যুক্তিতে পানীয় জল পুনর্নবীকরণ যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ। কিন্তু প্রতিটি খনিজ পদার্থ (জৈব ও অজৈব) পরিবেশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন পদার্থের এই চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার সময় সীমা বিভিন্ন। মানব জীবন এবং এক একটি মানব সভ্যতার নিরীখে কোন কোন চক্রের পর্যায়কাল ক্ষুদ্র আবার কোন কোন চক্রের পর্যায়কাল অতিদীর্ঘ। জলচক্রের আবর্তনের পর্যায়কাল অতিক্ষুদ্র। জলসংকটের আওয়াজকে হাজির করার উদ্দেশ্য হল, জলবিশুদ্ধকরণ যন্ত্রপাতি এবং বোতলবন্দী জলের বাজার সৃষ্টি করা। সমুদ্রের জলকে লবনমুক্ত করে পরিশোধন করলে ভূ-গর্ভস্থ জলভাণ্ডারকে উত্তোলনের হার কমে যায়। ফলে ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না।

কীট নাশক, আগাছা নাশক রূপে লেড আর্সেনেট, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট, সোডিয়াম আর্সেনেট, প্যারীস গ্রীণ যৌগগুলি কৃত্রিম আর্সেনিক দূষণের মূল উৎস। কপার, সীসা, জিঙ্ক আকরিক উত্তোলন ও নিষ্কাশনে, কয়লা নিষ্কাশনেও প্রচুর আর্সেনিক ভূ-গর্ভস্থ জলে মেশে। আর্সেনিক ভারী মৌল হওয়ায় মাটির গভীরে চলে যায়। ফলে টিউব ওয়েলের জলে আর্সেনিক-এর পরিমাণ বাড়ে। প্রতি লিটার পানীয় জলে ০.৫ মি.গ্রা বা তার বেশী আর্সেনিক উপস্থিত থাকলে তা স্বাস্থ্য সম্মত নয়। ৬ মাস থেকে ২ বছর এই জল পান করলে মানবদেহে নানা রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই পরিশ্রুত উন্মুক্ত জলাশয়ের জল (সারফেস ওয়াটার বা নদী, পুকুর, লেক বা সমুদ্রের জল) পান করা টিউব ওয়েলের জলপান থেকে স্বাস্থ্য সম্মত।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলি একচেটিয়া কোম্পানীগুলির উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক বিক্রির বড় বাজার। কৃষকেরা ফলন বাড়াতে বা ফসল বাঁচাতে তা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেন। বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলি ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের শিক্ষিত করার এবং কৃষিক্ষেত্র তদারকী করার জন্য বাস্তুতঃ কোন ব্যবস্থাপনা নাই। এ বিষয়ে সরকারের কোন নজর নাই। জনস্বাস্থ্য নয়, মুনাফাই যেহেতু এই উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য তাই এই দূষণ নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নাই। কারখানাগুলির ক্ষেত্রেও রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ মালিকেরা পরিশ্রুত না করেই নদী-নালায় ফেলে। কাগজে-কলমে নিয়ম থাকলেও বাস্তুতঃ কেউ তা মানে না। মালিকের প্রয়োজনে কখনও সখনও দূষণের অভিযোগে কারখানা বন্ধ করা হয়।

একমাত্র সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা জনস্বার্থে সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হলে জলদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ বন্ধ হওয়া সম্ভব, অন্য কোনও উপায়ে নয়। উন্মুক্ত জলাশয়ের জল পরিশোধিত করে সকলের জন্য সরবরাহ করেই জলসংকট-এর বাস্তব সমাধান সম্ভব।

(চ) বিকল্প শক্তির উৎস

দূষণ রোধ এবং ফসিল ফুয়েল (কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাস) এর সঞ্চিত ভান্ডার নিঃশেষ হবার সম্ভাবনার কারণে সভ্যতার অগ্রগতি যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাই বিকল্প শক্তির উৎস আবিষ্কার ও ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। কৃত্রিমভাবে ইথানল উৎপাদন ও বায়োফুয়েলের ব্যবহার কয়েকটি দেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, যার মধ্যে ব্রাজিল অন্যতম। কিন্তু 'ফসিল ফুয়েল'-এর উত্তোলন ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সাথে 'বায়োফুয়েল' উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বাজার দখলের লড়াই কি ইঙ্গিত দেয়? সমস্যার সমাধান নয়, মুনাফার স্বার্থে এই বাণিজ্যিক যুদ্ধগুলি হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নাই। আর এর সাথে সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ফুয়েল ব্যবহারের জন্য আইন পরিবর্তনও যে একই লক্ষ্যে পরিচালিত তাতেও সন্দেহ করার কারণ নাই।

অচিরাচরিত শক্তিগুলির উৎস প্রায় সবই চিহ্নিত ও আবিস্কৃত হলেও তার ব্যবহার কোথাও ব্যাপকভাবে দেখা যায় না। কারণ এই শক্তির উৎসগুলি (বা তার কাঁচামাল) মালিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে নেই ফলে এর উৎপাদনকেও তারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। জোয়ার-ভাটা, সূর্যালোক, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রের ঢেউ, ভূ-গর্ভস্থ তাপশক্তি, গোবর ইত্যাদি থেকে ধারাবাহিকভাবে একই হারে উৎপাদন করা যায় না। আবার উৎসগুলির মধ্যে কতগুলি যেহেতু নিজেরাই শক্তিরূপে বিদ্যমান তাই বাজারের দাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও ব্যবহার (বিক্রি) এবং সংরক্ষণ করা অনিশ্চিত ও ব্যয়সাপেক্ষ এবং তেমন মুনাফাদায়ী নয়।

(ছ) পলিথিন (পলিপ্যাক), প্লাসটিক ব্যবহার

পলিথিন, প্লাসটিক প্রভৃতি কৃত্রিম জৈব পদার্থগুলি পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে বিয়োজিত হয় না। তাই বর্জ্য প্লাসটিক, পলিথিন মাটি বা জলে থাকলে মাটির বিভিন্ন উপাদান ও জলের চক্রাকারে আবর্তনে এবং জলপ্রবাহে বাধা দেয়। সরকারী প্রচারে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট মানের প্লাসটিক ও পলিপ্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ব্যবহৃত বর্জ্য প্লাসটিক, পলিথিন যত্রতত্র না ফেলতে।

পরিবেশের পক্ষে প্লাসটিক জাতীয় পদার্থ ক্ষতিকারক হলেও এর জন্য হওয়া দূষণের দায় ব্যবহারকারীদের উপর চাপানো যায় কিভাবে ? এর দ্বারা প্রস্তুতকারী কোম্পানীগুলি এবং তা অনুমতিদানকারীর, ব্যবহারকারী জনতার নয়। বাজারে বিক্রেতারা ব্যয় সংকোচনের জন্য এবং ক্রেতারা পণ্য পরিবহণে সুবিধার জন্য তা ব্যবহার করেন। এর বিকল্প পণ্য যেমন চটের বস্তা, কাগজের ঠোঙা ইত্যাদির দাম বেশি এবং তুলনায় কম ব্যবহার মূল্যের হওয়ায় সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করেন। এই জাতীয় পদার্থ উৎপাদন ও বন্টন নিষিদ্ধ করে আরও উপযোগী পদার্থের ব্যবহার চালু করা ছাড়া প্লাসটিক দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। সরকার ও বিভিন্ন এন জি ও-দের দ্বারা "প্লাসটিক ব্যবহার করবেন না" প্রচার তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন নিয়ে ভাল করে জানতে বুঝতে গেলে প্রথমে ভাল করে জানা দরকার প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে এবং পরিবেশ পরিবর্তনের ইতিহাস।

প্রাকৃতিক পরিবেশ কী ঃ এই পৃথিবীর স্থলভাগ জলভাগ ও বায়ুমন্ডলে অবস্থিত সকল সজীব ও জড়-বস্তুর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে যৌথ বসবাস রীতি গড়ে ওঠে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। মানুষ ব্যতীত সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশই শেষ কথা।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ইতিহাস

জড়জগৎ ও জীবজগৎ নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। আবার এই প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবেশ ও জীবজগৎ পরস্পর নির্ভরশীল, জীবজগৎ যেমন নির্দিষ্ট পরিবেশ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে জীবজগতের যেমন পরিবর্তন হয় তেমনই জীবজগতও পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সৌরমন্ডলের মধ্যে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট অবস্থানের জন্যই পৃথিবীতে যে বায়ুমন্ডল ও জলমন্ডল গড়ে উঠেছে তা জীবজগতের পক্ষে উপযোগী। পৃথিবীর বুকে এখন যে বায়ুমন্ডল দেখা যায় তা কি চিরকালই আজকের মত ছিল ? উত্তর হল না। সময়ের সাথে সাথে তার মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, চাপ, গ্যাসীয় উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে, সমুদ্রতল ওঠানামা করেছে (চিত্র ১ এবং ২)। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং জীবজগতেও পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমানে বায়ুমন্ডলের প্রধান দুটি উপাদান হল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এছাড়া আছে সামান্য পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প এবং ওজোন গ্যাস। এই গ্যাসগুলি প্রধানভাবে বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বা তার উপরে সৌর বিকিরণের প্রভাবে ফটোলাইসিস বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে আদি বায়ুমন্ডল সৃষ্টি হয়েছিল মূলত তিনটি প্রক্রিয়ায় ঃ (১) সৌর নেবুলা থেকে পৃথিবী সৃষ্টির পর বাকী গ্যাসীয় উপাদান থেকে (২) মহাবিশ্বের অন্যত্র থেকে আসা (উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি) উপাদান থেকে এবং (৩) অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত গ্যাস থেকে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে পৃথিবী সৃষ্টির পর প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ হেডিয়ান ও আর্কিয়ান যুগের প্রথম পর্যায়ে বায়ুমন্ডলে ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড এবং অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং নাইট্রোজেন। সময়ের সাথে সাথে বায়ুমন্ডলে গ্যাসীয় উপাদানগুলির পরিমাণ ও উপাদানের সংখ্যা বেড়েছে।

পরিবেশ ভাবনার স্বরূপ ও সমাধান

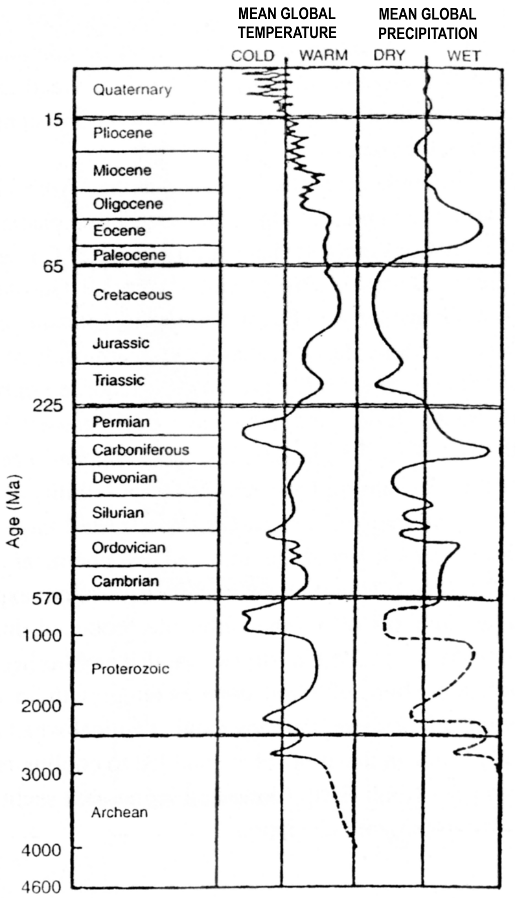

চিত্র - ১ ঃ পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য। সূত্র : Earth as an Evolving Planetary System - Kent C. Condie (2005)

আদিম পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন গ্যাস উৎপত্তি হল কিভাবে ? প্রধানতঃ তিনভাবে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে ঃ (১) আলোক সংশ্লেষের আলোক দশায় ফটোলাইসিস বিক্রিয়ায় জলের অণুর ভাঙণের ফলে। (২) বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে জলীয় বাষ্প কণার ফটোলাইসিস প্রক্রিয়ায়। (৩) সামুদ্রিক জল ও মাটিতে থাকা সালফেট ও কার্বোনেট যৌগের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পৃথিবীর সৃষ্টির সময় এবং তার প্রায় ২৫০ কোটি বছর বা আরও বেশি সময় ধরে সবাত শ্বসনকারী উদ্ভিদের উপস্থিতি ছিল না। তাই বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ভর করত উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণের জন্য। অগ্নুৎপাত বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্পকণার হারকে প্রধানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বলে অগ্নুৎপাতের হারও এই কারণে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন সৃষ্টির অপ্রত্যক্ষ কারণ।

পৃথিবীর জন্মের প্রায় ১০০ কোটি বছর পর অর্থাৎ আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম জীবের সৃষ্টি হয় সমুদ্রে। অজৈব পদার্থ থেকে এই জৈব পদার্থ কিভাবে বা কেন সৃষ্টি হয়েছিল তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্বে না এলেও বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে তৎকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশে বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পদার্থগুলির বিক্রিয়ার ফলেই প্রথম এককোষী জীব সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার তৎকালীন পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে উপস্থিত গ্যাসীয় পদার্থ যেমন মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্পকে নিয়ে পরীক্ষাগারে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে এক রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করেন যার নাম অ্যামাইনো এসিড। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড হল সমস্ত প্রোটিন জাতীয় পদার্থের মৌলিক একক, যা জীবের গঠন, বেঁচে থাকা এবং প্রজননের প্রধান উপাদান। আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে বায়ুমন্ডলের অজৈব উপাদান থেকেই সমুদ্রে প্রথম এককোষী জীবের সৃষ্টি। সামুদ্রিক চুনাপাথর, ফসফেট এর মধ্যে ৩৫০ কোটি বছর আগেকার স্ট্রোমাটোলাইট (ট্রেস ফসিল) পাওয়া গেছে যা এককোষী প্রাণীর চিহ্ন বহণ করে। লৌহ আকরিকে এমন এককোষী প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া গেছে যার বয়স ২৫০ থেকে ১৮০ কোটি বছর আগেকার। প্রথম এককোষী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয় ১০০ কোটি বছর আগে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন, জীবের বিবর্তন এবং প্রধান প্রধান বিলুপ্তির যুগকে এখন সংক্ষেপে দেখা যাক।

● আজ থেকে প্রায় ৪৫৬ কোটি বছর আগে সোলার নেবুলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়।

● আজ থেকে ৪৫১ কোটি বছর আগে চাঁদের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৯০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে উল্কাপাত হয়।

● আজ থেকে ৩৫০ কোটি বছর আগে সমুদ্রে প্রথম এককোষী জীবের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৪০ কোটি বছর আগে প্রথম মাইক্রোফসিল ও স্ট্রোমাটোলাইট পাওয়া যায়।

● আজ থেকে ২৭০ কোটি বছর আগেকার প্রথম রাসায়নিক ফসিল প্রমাণ করে উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ বিক্রিয়ার সূচনা।

● আজ থেকে ২৫০ কোটি বছর আগে প্রাচীন মহাদেশগুলির গঠন সম্পূর্ণ হয়।

● আজ থেকে ২৫০-১৮০ কোটি বছর আগে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা পর্যাপ্ত হয় এবং বায়ুমণ্ডল সবাত শ্বসনের পক্ষে উপযুক্ত হয়।

● আজ থেকে ২২০ কোটি বছর আগে উন্নত নিউক্লিয়াস

যুক্ত কোষের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ১৮০ কোটি বছর আগে সামুদ্রিক শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়।

● আজ থেকে ১০০-৭০ কোটি বছর সময়কালে পৃথিবীতে অমেরুদন্ডী প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৫৮ কোটি বছর আগে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বিপুল হারে দ্বিতীয় বার বৃদ্ধি পায়। পৃথিবী জুড়ে নানা প্রকার বহিঃকঙ্কাল বিশিষ্ট অমেরুদন্ডী প্রাণীর যেমন ট্রাইলোবাইট, গ্র্যাপটোলাইট ইত্যাদির জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৫৪.২ কোটি বছর আগে অমেরুদন্ডী প্রাণীগুলি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

● আজ থেকে ৫৩ কোটি বছর আগে প্রথম মরুদণ্ডী প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৪৭ কোটি বছর আগে মহাদেশীয় উদ্ভিদের জন্ম হয়।

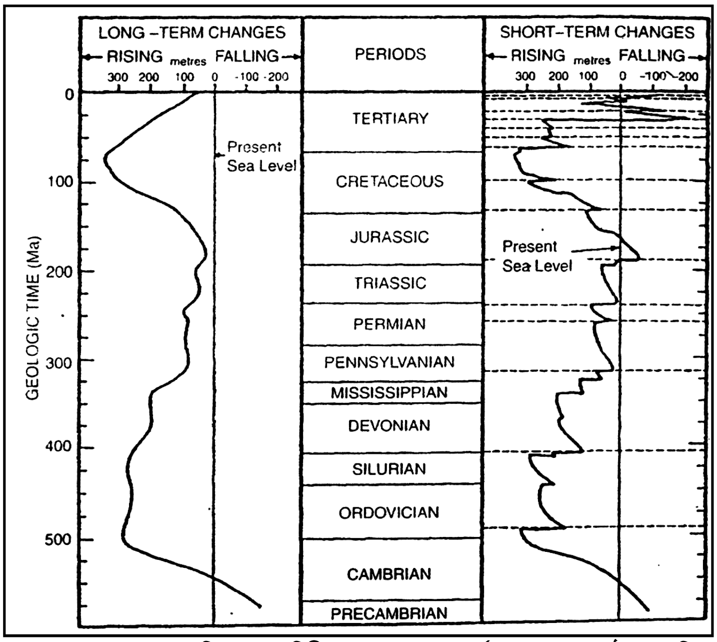

চিত্র - ২ ঃ পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত সমুদ্র তলের ওঠানামার চিত্র।
সূত্র : Earth as an Evolving Planetary System - Kent C. Condie (2005)

● আজ থেকে ৪৩.৩ কোটি বছর আগে বায়ুমন্ডলের গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি, সমুদ্রতলের বিশাল পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটে।

● আজ থেকে ৪২ কোটি বছর আগে মহাদেশীয় প্রাণীর প্রথম জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৪১ কোটি বছর আগে ভাসকুলার প্লান্ট-এর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৭ কোটি বছর আগে প্রথম উভচর প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩৫.৯ কোটি বছর আগে আবার বহু সংখ্যক উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিলুপ্তি ঘটে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানিয়ে নিতে না পারার জন্য।

● আজ থেকে ৩৩ কোটি বছর আগে প্রথম সরীসৃপের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৩১ কোটি বছর আগে প্রথম পতঙ্গের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ২৫.১ কোটি বছর আগে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিলুপ্তি ঘটে।

● আজ থেকে ২১.৫ কোটি বছর আগে প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ২১ কোটি বছর আগে প্রথম সপুষ্পক উদ্ভিদের জন্ম হয়।

● আজ থেকে ৬.৫ কোটি বছর আগে ডাইনোসর, অ্যামোনাইট সহ প্রচুর মেরুদণ্ডী, অমেরুদন্ডী প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের বিলোপ ঘটে।

● আজ থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে প্রথম মনুষ্যজাতীয় (হোমিনিড) প্রাণীর জন্ম হয়।

● আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর আগে আধুনিক মানুষ হোমোসেপিয়ান-এর জন্ম হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে পৃথিবীর পরিবেশ জীব বসবাসের উপযুক্ত হওয়ার পরই জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রথম উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ছিল অবাত শ্বসনকারী কারণ তখন বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের অভাব ছিল। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা পর্যাপ্ত হওয়ার পরই সবাত শ্বসনকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। জীব সৃষ্টির পরে বহুবার প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে এবং জীবকূল এই পরিবর্তনের সাথে নিজেদের অভিযোজিত করেছে। যারা পারে নি তারা অবলুপ্ত হয়েছে। এটাই প্রকৃতির শাসন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের এই পরিবর্তনের মূল কারণ শক্তির ভারসাম্যের সমীকরণের পরিবর্তন। জীবজগতে সকল শক্তির উৎস সূর্য। সূর্য সাপেক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আপেক্ষিক অবস্থান বিভিন্ন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আগত সৌরশক্তির উপর নির্ভর করে উৎপাদক ও নানাবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যকার খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ ঘটে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনচক্রগুলি জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। সূর্য থেকে আগত শক্তি শোষণ করার পর পৃথিবী থেকে বিকিরিত শক্তির একটা অংশ বায়ুমন্ডলের গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির দ্বারা আবদ্ধ থাকায় পৃথিবী জীব বসবাসের উপযুক্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্রীণ হাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রা হত – ১৮° সেলসিয়াস, যা জীবজগতের বসবাসের পক্ষে অনুপোযুক্ত। সুতরাং পরিবেশে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীণহাউস গ্যাসগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং বিভিন্ন জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌল ও যৌগগুলির ভারসাম্য রক্ষা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনভাবে (ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, উল্কাপাত, বহির্বিশ্বের কোনও ঘটনা) শক্তির (পরিমাণের) পরিবর্তন ঘটলে অর্থাৎ শক্তি সংযোজিত বা বিয়োজিত হলে শক্তির ভারসাম্যের নতুন সমীকরণ গঠিত হয় এবং সম্পর্কিত জৈব-ভূ-রাসায়নিক চক্রগুলির (বায়ো-জিও-কেমিক্যাল সাইকেল) পর্যায়কাল, স্থায়িত্ব, চক্রের মধ্যবর্তী কোন কোন মৌল বা যৌগের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবজগৎ ও নিজেদের অভিযোজিত করতে থাকে। পরিবেশের পরিবর্তনের মাত্রা জীবজগতের যে যে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করার বাইরে চলে যায় – তারা বিলুপ্ত হয়। আর যারা অভিযোজনে সক্ষম হয় তারা টিঁকে যায়, সৃষ্টি করে নতুন প্রজাতির। অভিযোজনের পথ ধরে অভিব্যক্তির সত্যতা প্রমাণ করে – পরিবেশের ভারসাম্য গতিশীল।

পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হওয়ার একটি আধুনিক উদাহরণ পিপার মথ

ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে সাদা হাল্কা বর্ণের প্রচুর পিপার মথ দেখা যেত। শিল্প বিপ্লবের প্রথম দশকগুলিতে কয়লা জ্বলনের হার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশে ঝুল ও ভুসাকালি বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গাঢ় বর্ণের পিপার মথ নজরে আসে। আর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেস্টারে গাঢ় বর্ণের পিপার মথের হার দাঁড়ায় ৯৮%। সাদা পিপার মথ-এর নাম টাইপিকা এবং কালো পিপার মথের নাম কার্বনারিয়া। ওই সময় বিভিন্ন প্রকৃতিবিদ লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে হাল্কা বর্ণের টাইপিকা-র সংখ্যা বেশী এবং ঝুল ও ভুসাকালি আবৃতি শিল্পাঞ্চলে গাঢ় বর্ণের কার্বনারিয়া-র সংখ্যা বেশী। এই পরিসংখ্যান থেকে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে গাঢ় বর্ণের মথগুলি পরিবেশ পরিবর্তনের শিকার।

জীববিজ্ঞানী কেটলী ওয়েল পিপার মথের এই বর্ণ পরিবর্তনকে অভিযোজনের উদাহরণ বলে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী সময়ে পরিশ্রুত জ্বালানীর ব্যবহার বাড়লে পরিবেশে ঝুল ও ভুসাকালি কমতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়ভাবে কার্বনারিয়া মথের অবলুপ্তি ঘটে।

অভিব্যক্তি সম্পর্কিত জীববিদদের মধ্যে পিপার মথের কার্বনারিয়া-র উত্থান ও পতনের কারণ নিয়ে মতভেদ আছে। কেটলীওয়েল সহ অধিকাংশ জীববিদের মতে শিকারী পাখির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, ঝুল-কালি আবৃত গাছের কান্ডে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য গাঢ় বর্ণের কার্বনারিয়া গ্রুপের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর পরিশ্রুত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশে ঝুল-কালি কমে গেলে আবার হাল্কা বর্ণের টাইপিকা মথের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী মেজেরাস কেটলী ওয়েলের ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ বলেছিলেন। কারণ তাঁর মতে পাখি আল্ট্রা ভায়োলেট (অতি বেগুনী) রশ্মিতে ভাল দেখে। সুতরাং শিকারী পাখির হাত থেকে বাঁচার জন্য তার মানুষের মত বর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। তবে পিপার মথের বর্ণ পরিবর্তনের ঘটনার অন্তত একটি কারণ শিকারী পাখীর হাত থেকে বাঁচা এই বিষয় অধিকাংশ জীববিদই একমত। তাঁদের মতে পিপার মথের বর্ণ পরিবর্তনের ঘটনা প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের উদাহরণ। পিপার মথের এই বর্ণ পরিবর্তন অভিযোজন তথা গতিশীল সাম্যের উদাহরণ। এখনও পর্যন্ত এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে অভিযোজনের উদাহরণ আর নেই, থাকলেও তা অনাবিষ্কৃত। এটি সম্ভব হয়েছে পিপার মথ-এর ছোট জীবন চক্র হওয়ায় এবং পরিবেশ পরিবর্তনের হার দ্রুত হওয়ায়। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে সময়ের সাপেক্ষে পরিবশ পরিবর্তনের হার অভিযোজন ও অভিব্যক্তির হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মোবাইল ফোন ব্যবহার পরিবেশ ও মানবদেহে কতটা বিপজ্জনক?

সেল ফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার নিয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিজ্ঞানী মহলে প্রচুর বিতর্ক চলছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনগুলিতে এখনও পর্যন্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পর্কিত কোনও বক্তব্য উপস্থাপিত হয়নি। কিন্তু মোবাইল ফোনের ব্যবহার প্রাকৃতিক পরিবেশের সজীব উপাদানের যেমন মৌমাছি, কীট পতঙ্গ, পাখি, নারিকেল-তাল প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং মানব শরীরে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সে বিষয় বৈজ্ঞানিক মহল এখনও দ্বিধাবিভক্ত।

বহু অনুসন্ধানমূলক গবেষণার মাধ্যমে ২০০৭ সালে এস সি ই এন আই এইচ আর (ইওরোপীয়ান কমিশন সায়েন্টিফিক কমিটি অন ইমার্জিং এন্ড নিউলি আইডেন্টিফায়েড হেল্থ রিস্ক) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মানবদেহে ক্যানসার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আর এফ)-এর কোনও ভূমিকা নেই।

মোবাইল ফোন থেকে নির্গত রেডিও তরঙ্গের একটি অংশ মানব মস্তিষ্কের দ্বারা শোষিত হয়। বিভিন্ন কোম্পানীর মোবাইল

ফোন থেকে নির্গত রেডিও তরঙ্গের পরিমাণ বিভিন্ন। প্রত্যেক দেশে, কোন মোবাইল ফোন থেকে নির্গত শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় ফোনটির মান এবং নিয়ন্ত্রকারী সংস্থার উপর। যে হারে মানবদেহ মোবাইল ফোনের বিকিরণকে গ্রহণ করতে পারে তা পরিমাপ করা হয় স্পেসিফিক অ্যাবসরপশন রেট (এস এ আর)-এর সর্বোচ্চ মান দ্বারা। আধুনিক মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে এস এ আর-এর সীমা নির্ধারিত হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির (গভর্নমেন্টাল রেগুলেটিং এজেন্সি) দ্বারা। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (এফ সি সি) দ্বারা।

বিজ্ঞানীদের মতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকালীন সময় মস্তিষ্কের যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তা উন্মুক্ত সূর্যালোকে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় নগণ্য। মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালনের হার বৃদ্ধি পেয়ে স্থানীয়ভাবে এই অতিরিক্ত তাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু চোখের কর্নিয়ায় এই প্রকার তাপনিয়ন্ত্রণকারী কোনও ব্যবস্থা নেই। টানা ২/৩ ঘন্টা সময়কাল পার হলে শশক জাতীয় (র‍্যাবিট) প্রাণীর চোখে ১০০-১৪০ ওয়াট/কি.গ্রা. মানের এস এ আর-এর প্রভাবে চোখে ছানি পড়ছে। অথচ একই শর্ত বজায় রাখলেও বানরের চোখে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটে নি। মানবদেহের উপর এরকম পরীক্ষা এখনও হয়নি।

জার্মান বায়োফিজিসিস্ট রোনাল্ড গ্লেসার-এর মতে মানবদেহের কোষে বহু তাপ-গ্রাহক অণু বর্তমান, যারা মোবাইল ফোন ব্যবহারে উদ্দিপ্ত হয় এবং কোষের মধ্যে বিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রোটিন অণু-র সঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবহারে উৎপন্ন তাপ-এর কোনও সম্পর্ক নেই।

লান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সুইডিশ গবেষক ইঁদুরের মস্তিষ্কের উপর মাইক্রো ওয়েভ রেডিয়েশন নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে প্রত্যক্ষ করেন যে, ইঁদুরের মস্তিষ্কে অ্যালবুমিন ক্ষয় পায়। পূর্বে এ বিষয়ে অ্যালন ফ্রে, হকিন্স, অ্যালবার্ট ও ফোন-এর একই মত ছিল।

ডেনমার্কে ৪,২০,০০০ জন শহরবাসীর উপর ২০ বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে ২০০৬ সালে প্রকাশিত পত্রে বলা হয়েছে যে মোবাইল ফোন ব্যবহার-এর সঙ্গে ক্যানসার বৃদ্ধির কোনও সম্পর্ক নেই। জার্মান 'ফেডারেল অফিস – রেডিয়েশন প্রোটেকশন' এই রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে।

ব্রেন টিউমার এর সঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ১৩টি দেশ কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ হাজির করতে পারে নি। ২০১০ সালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার-এর ডাইরেক্টর ড. ক্রিস্টোফার ওয়াইল্ড বলেন, "মস্তিষ্কে ক্যানসার বৃদ্ধির সাথে মোবাইল ফোন ব্যবহারের কোনও সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। ... এ বিষয়ে পুনরায় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।" অস্ট্রেলিয়ান রেডিয়েশন প্রোটেকশন এন্ড নিউক্লিয়ার সেফটি এজেন্সি-র মতে "মানব মস্তিষ্কে ক্যানসার ও মোবাইল ফোন ব্যবহারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও ভিত্তি নাই।"

২০০৪ সালে সুইডেনের ক্যারলিনস্কা ইনস্টিটিউট-এর মহামারী সংক্রান্ত আলোচনাচক্রে এই বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয় যে ১০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে মোবাইল ফোন নিয়মিত ব্যবহারের ফলে 'অ্যাকাসটিক নিউরোমা' রোগ হবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ১০ বছরের কম সময় ধরে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন তাদের ক্ষেত্রে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায় নি।

২০০৭ সালে সুইডেনের অরেব্রো ইউনিভার্সিটি থেকে ডঃ লেনার্ট হার্ডেল কর্তৃক প্রকাশিত পত্রে বলা হয় ঃ

(১) মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর এক প্রকার ক্যান্সার টিউমার (ম্যালিগন্যান্ট গ্লায়োমা) হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, (২) মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে এক প্রকার নার্ভের রোগ (অ্যাকাসটিক নিউরোমা) বৃদ্ধি পাচ্ছে, (৩) মস্তিষ্কের পাশে টিউমার হবার ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের ব্যবহার অনেকাংশে দায়ী, (৪) গড়ে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে ১০ বছর বা তার বেশী সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে টিউমার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

২০১১ সালের ১৪-৩১শে মে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ এইচ ও)-র উদ্যোগে ১৪টি দেশের মোট ৩১ জন বিজ্ঞানী ফ্রান্সের লিঁয় শহরে অনুষ্ঠিত আই এ আর সি-এর সভায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে কার্সিনোমা বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সম্মতি জানিয়েছে। তাঁদের মতে গড়ে ৩০ মিনিট করে ১০ বছরের অধিক সময় ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে এর সম্ভাবনা রয়েছে।

[The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radio frequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B)*, based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use] Group 2B - The agent is possibly carcinogenic to human.

মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং জীবদেহে (বিশেষতঃ মানবদেহে) তার প্রভাব নিয়ে প্রকাশিত এই সব অসংখ্য মতামতগুলির কোনটি এর ক্ষতিকারক দিকের পক্ষে আর কোনটি ক্ষতিকারক দিকের বিপক্ষে। কিন্তু কোনও মতামত থেকেই কার্য-কারণ সম্পর্ক জানা যায় নি। শুধুমাত্র স্যাম্পেল সার্ভের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছানো হয়েছে। গবেষণার পরিসংখ্যান তথ্য আর পরিসংখ্যান তথ্যের গবেষণা – এক বিষয় নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে, তার প্রয়োগগত ফলাফল থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা এক জিনিস, আর আনুমানিক সত্যের উপর নির্ভর করে

পরিসংখ্যান তথ্যের সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্য জিনিস। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি আর যাই হোক, বিজ্ঞান সম্মত নয়।

তবে মোবাইল ফোনের বাজার এবং তার সংযোগ বা 'কানেকশন' এর বাজার ক্রমবর্ধমান। বিজ্ঞান-এর অতিমূল্যবান আবিষ্কারটির অপব্যবহারই এর বাজার বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৫০০ কোটি মানুষ মোবাইল পরিষেবার গ্রাহক। মোবাইল ফোন ব্যবহারে শারিরীক ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক থাকলেও, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষ এ বিষয়ে একমত যে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক জীবনে এক 'অশনি সংকেত' বহণ করছে। এই পরিষেবা এতটাই জীবন্ত, যে কর্মজীবন ছাড়া অন্য সময় এর ব্যবহারে সময় ও জনসংযোগে যে ঘাটতি সৃষ্টি করে তা ব্যবহারকারীর উপলব্ধিতেই আসে না। ফলে প্রায় শোনা যায় রাস্তায় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে, এই ফোনের সাহায্যে তরুণীর একান্ত ব্যক্তিগত ছবি ক্যামেরাবন্দী করে তাকে ব্ল্যাকমেল করায় আত্মহত্যা বাড়ছে, নিজের পরিচয় গোপন করে বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে উত্তক্ত করা হচ্ছে ইত্যাদি। সময়কে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করার এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি পরিণত হয়েছে সময় অপচয় করার যন্ত্রে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটায় না বলে, বলা ভাল অবক্ষয়ী সমাজের সাংস্কৃতিক নগ্নরূপ আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ পায় মোবাইল ফোনের ব্যবহারের মাধ্যমে।

পরিবেশ দূষণের দায় কার?

একথা সত্য যে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন, শক্তি উৎপাদন, উন্নত যানবাহন ব্যবহার, পলিপ্যাকের ব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় তথা ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য পরিবেশে কিছু কিছু উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে, নতুন পদার্থ পরিবেশে সংযোজিত হয়েছে মনুষ্যজনিত কারণে। মানব জীবনে এদের ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

পৃথিবীর বুকে শিল্প উৎপাদনের সূচনা ও বিকাশ ঘটেছে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে, পুঁজিপতি শ্রেণীর হাত ধরে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির লক্ষ্য মুনাফা হওয়ায় উৎপাদনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তার প্রভাব সে গ্রাহ্য করে না, যতক্ষণ না তা তার মুনাফার স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে। বরঞ্চ প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাবকে অজুহাত রূপে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন মুনাফার ক্ষেত্র তৈরী করে। দূষণ রোধের নামে দূষণ রোধকারী যন্ত্রের বাজার, কার্বন বাণিজ্য, বনসৃজন প্রকল্প তারই উদাহরণ। দূষণ রোধের আইন মূলতঃ কার্যকর করা হয় সাধারণ মানুষের উপর। সম্প্রতি পরিবেশ দূষণ-কে সামনে রেখে পেট্রোল-ডিজেল চালিত অটো-র পরিবর্তে এল পি জি অটো চালু করা হল। প্রচুর নতুন গাড়ি বিক্রি হল, ব্যাঙ্কের ক্রেডিট ব্যবসা সচল হল। কিন্তু এই নতুন অটোগুলিতে যে জ্বালানি ব্যবহার হচ্ছে তাও এই প্রকার খনিজ হাইড্রোকার্বন। এর দহনেও পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে। তাহলে এই সিদ্ধান্ত পরিবেশে কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি রোধ করার স্বার্থে করা হল কী? কারখানার মালিকরা তরল বর্জ্য পদার্থগুলি পরিশোধন না করে নদী-নালা-জলাশয়ে ফেলছে, তেজস্ক্রীয় চুল্লীর আবর্জনা অধিকাংশ সময় নিষ্ক্রিয় না করে সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে। দূষণ রোধের আইন লাগু করায় সারা দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত ক'জন মালিকের শাস্তি হয়েছে? শিল্প নিরাপত্তা আইনগুলি বই-এর পাতায় বন্দী হয়ে থাকে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এক শ্রেণীর কার্যকলাপের দায় সমগ্র মানব সমাজের উপর বর্তায় না। তাই পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফা লোটার উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবেশ দূষণের দায় শুধুমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর, সমগ্র মানব জাতির নয়।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ

মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়, এমন নয়। প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের। সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তিতে। আর্থ-সামাজিক কাঠামোই গড়ে দেয় মানুষে মানুষে সম্পর্ক। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশীরভাগ মানুষের জন্য উৎপাদন হয় না, সেখানে যার কেনার ক্ষমতা আছে সে পাবে আর যার সেই ক্ষমতা নেই সে পাবে না। প্রয়োজন অনুসারে যারা পেল না আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত যারা পেল, তাদের মধ্যে কি কখনও সমমানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে?

বস্তু থেকেই চিন্তা বা চেতনার সৃষ্টি হয়, চেতনা থেকে বস্তু নয়। পেটে যার ভাত নেই তাকে সৎ থাকার উপদেশ দিলে কি কাজ হয়? তেমনি খাবার নষ্ট করার অভ্যাস বজায় রেখে সকলের খাবার জোগাড় করা স্বপ্ন দেখাও অলীক কল্পনা। এর মানে এই নয়, যে অপচয় বন্ধ হলেই সমস্যার সমাধান হবে। যে কারণে অপচয় করার অভ্যাস সৃষ্টি হয় তা নির্মূল না করে, অপচয় বন্ধ করার চেষ্টা করে সকলের খাবার জোগাড় করা সম্ভব নয়। সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্যই দুটি পরস্পর বিপরীত ও বিরোধী সংস্কৃতির জন্ম দেয় – একটি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় অর্থাৎ প্রগতিশীল আর অপরটি সমাজকে পিছনের দিকে টেনে রাখতে চায় অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল। আমাদের সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিকে বেছে নিয়ে, এগিয়ে চলার বাধা অপসারণেই ব্রতী হতে হবে। পরিবেশ ভাবনার ক্ষেত্রেও আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে হবে। ■

প্রাচীন লিপি

– উৎপল ভট্টাচার্য

মানুষ উদ্ভাবনশীল, সে তার চারপাশে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ করে এর মধ্যেকার প্রকৃত বিজ্ঞানকে খুঁজে নেয় ও তা থেকে শিক্ষালাভ করে। নিজের কাজে লাগায়। মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ তার চারপাশের বিভিন্ন বস্তুকে ধীরে ধীরে তার কাজে লাগিয়েছে, নিজের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়েছে। আস্তে আস্তে সে তার জীবনের নানা ঘটনাকে প্রকাশ করার জন্য গুহার দেওয়াল অথবা জমিতে আঁক কষতে শিখেছে। ঘটনাচক্রে এটাই ছিল মানুষের লেখার প্রথম পাঠ।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গুহা, জমি, গাছের বাকল, পাথর, মসৃণ পশুচর্ম ইত্যাদিতে লিখতে শুরু করেছে। সময় যত এগিয়েছে ততই লেখার পদ্ধতি উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। এই লেখা সংরক্ষণ করার জন্যও মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে।

প্রাচীনকাল থেকে লিখে আসা এই সব লিপি থেকে জানা যায় মানুষের জীবনযাত্রার কথা, মানুষের শ্রম কীভাবে পৃথিবী এবং তার জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেছে সেই কথা। এছাড়া জানা যায় সভ্যতার শুরু থেকে একদল মানুষ কীভাবে বাকি সবাইকে শোষণ করেছে সেই কথা।

আনুমানিক খ্রী.পূ. ৪র্থ সহস্রাব্দে মিশরে লিপির উদ্ভাবন হয়। সেসময় মিশরীয়রা তাদের চর্চিত জ্ঞান লিপির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে শুরু করে।

প্রথম দিকে মিশরীয়রা ছবির মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এক একটা শব্দ বোঝানোর জন্য তারা এক একটা ছবি ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে প্রতিটি অক্ষরের জন্য তারা আলাদা আলাদা ছবি ব্যবহার করত। ছবি দ্বারা লেখার এই পদ্ধতিকে বলে হায়ারো গ্লিফ; [গ্রিক শব্দ 'হিয়েরোস্ (পবিত্র) ও 'গ্লিফেইন' (খোদাই করা) শব্দদ্বয় মিলে তৈরী]। প্রায় ৭৫০টি ছবির সমন্বয়ে এই 'হায়ারোগ্লিফিক লিপি' তৈরী হয়েছিল। লেখার জিনিসপত্র মিশরে সুলভ ছিল। নীল নদের দুই তীরবর্তী নল খাগড়া জাতীয় একধরণের গাছ (নাম 'পাপিরস') থেকে মিশরীয়রা লেখার সরঞ্জাম বার করত। তারা এই গাছের কান্ডকে পাতলাভাবে চিরে এই গাছের পাতার ওপর সাঁটত এবং এই পাতাকে রং-এ চুবিয়ে তার ওপর লিখত। অনেক সময় যখন প্রচুর লিখতে হত তখন তারা একটি পাতার নিম্নাংশে আর একটি পাতা আঠা দিয়ে জুড়ে লিখত। এভাবে তৈরী পাপিরস ফিতে ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হত। এছাড়াও মিশরীয়রা পাথর খোদাই করে লিখত। ১৯২০ সালে ফরাসি অধ্যাপক শাঁ পোলিয়েঁ সর্বপ্রথম মিশরের লিপির পাঠোদ্ধার করেন। এর পরে আরো অনেক লিপির পাঠোদ্ধার হয়। এগুলি থেকে প্রাচীন মিশরের ফারাওদের, পুরোহিতদের ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অনেক তথ্য পাওয়া গেছে।

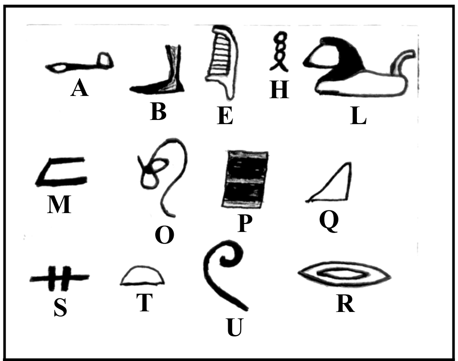

কয়েকটি হায়রোগ্লিফিক লিপি (বর্ণ)

কয়েকটি হায়রোগ্লিফিক লিপি (শব্দ)

মিশরে লিপির উদ্ভবের প্রায় সমসাময়িক ক্ষেত্রে মেসোপটেমিয়ায় লিপির আবির্ভাব হয়েছিল। এখানে এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরী ছোটো ছোটো স্লেট বা মৃত্তিকাফলকে লেখা হত। এগুলিকে পরে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হত। মৃত্তিকাফলকগুলির ওপর সূচালো কাঠি দিয়ে অক্ষর দেগে দেওয়া হত। এই সময় প্রায় হাজারখানেক ধরণের সংকেত চিহ্ন ব্যবহৃত

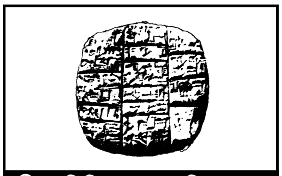

কীলকলিপিতে ভরা মৃত্তিকাফলক

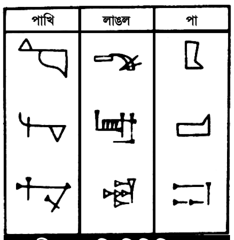

কীলকাকৃতি লিপিচিহ্নের মর্মোদ্ধার : পাখি, লাঙ্গল ও পা

হত ও কয়েকটি সংকেত চিহ্ন দিয়ে এক-একটি অক্ষর গড়ে উঠত। এধরণের লিপিকে বলা হত কীলকলিপি (ইংরেজিতে Cuneiform)। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এই লিপি ব্যবহৃত হত। খ্রী.পূ. ৮-৭ম শতকে তাই গ্রিস নদীর তীরে 'অসিরীয় সাম্রাজ্য' গড়ে ওঠেছিল। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভে খননের ফলে একটি গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয় যার মধ্যে এরকম প্রায় ২০,০০০ 'গ্রন্থ' সংরক্ষিত ছিল। এগুলি থেকে সেসময়কার পুরানো কথা, অনুশাসন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে জানা গেছে। সেসময় মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দক্ষ নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসাবে ফিনিসীয় জাতি খ্যাতি অর্জন করেছিল। লিপির বিকাশে তাদের দান সর্বাধিক ছিল। তারা কীলকলিপির বদলে একধরণের বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল, এতে কোনো স্বর-বর্ণ না থাকলেও ২২টি ব্যঞ্জন বর্ণ ছিল।

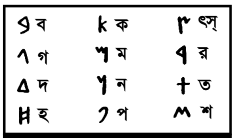

ফিনিসীয় বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার সময় ভারতে প্রথম লিপির উদ্ভব হয় (আনুমানিক)। খ্রী.পূ. ৩য়-২য় সহস্রাব্দে ভারতে নতুন আর একধরণের লিপির উদ্ভব হয় যার ভিত্তি ছিল ফিনিসীয় বর্ণমালা। এই নতুন ভারতীয় বর্ণমালাতে শুধু ধ্বনি বোঝাবার জন্য এবং সম্পূর্ণ সিলেব্‌ল্ বোঝাবার জন্য আলাদা আলাদা বর্ণমালা ব্যবহৃত হত। এগুলি তালপাতা কেটে শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর লেখা হত। মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপির কিছু লেখা হয়েছিল খরোষ্ঠী অক্ষরে, কিছু লেখা হয়েছিল ব্রাহ্মী অক্ষরে। এশিয়া মাইনরে 'বোঘজকোই' শিলালিপি থেকে আর্যদের ভারত আগমনের কাল নির্ণয় করা যায়। কলিঙ্গরাজ খারবেলের 'হাতিগুম্ফা' লিপি, রুদ্রদামনের 'গিরনার' ও 'জুনাগড়' লিপি, বাংলার পাল সম্রাটদের 'খালিমপুরের তাম্রলিপি' প্রভৃতি থেকে ইতিহাসের অনেক তথ্য জানা গেছে।

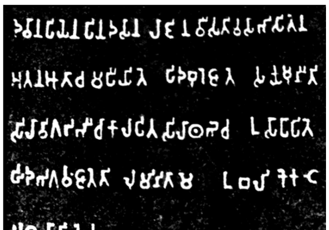

অশোকের শিলালিপি

খ্রী.পূ. ২য় সহস্রাব্দে চীনে লিপির উদ্ভব হয়। তারা অক্ষর হিসাবে চিত্রলিপি-বর্ণমালা ব্যবহার করত। চিত্রলিপির প্রতিটি অক্ষরে সমগ্র একটি শব্দ বোঝানো হতো। যেমন এই চিত্রলিপিতে অক্ষরের মানে 'গাছ', অক্ষর দ্বয়ের মানে 'বন', অক্ষর ত্রয়ের অর্থ ' ঝোপজঙ্গল'। চীনের লিপিতে কয়েক হাজারে বর্ণমালা ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকালে চীনে হাড় বা রেশমী কাপড় বা বাঁশের চটার ওপর লেখা হতো। রেশম খুব দামী ছিল বলে তা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার জন্য ব্যবহৃত হত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। ছেঁড়া কাপড়, বাঁশ, গাছের বাকল দিয়ে কাগজ তৈরী হত।

প্রাচীন গ্রীসে একপ্রকার লিপিমালার প্রচলন ছিল যা খ্রী.পূ. ২য় সহস্রাব্দে উঠে যায়। হোমারীয় যুগের শেষে গ্রীকরা ফিনিসীয় লিপির সাথে পরিচিত হয়ে ২৪ অক্ষরের এক বর্ণমালার উদ্ভাবন ঘটায়। গ্রীকরা পাপিরসের, মাটির স্লেটের ওপর লিখত। এছাড়া মোম দিয়ে পালিশ করা তক্তার ওপরও লেখার প্রচলনও ছিল। তারা যেকোনো ধাতু নির্মিত ছড়ির একপ্রান্ত ধারালো করে নিয়ে সেই প্রান্তদেশ দিয়ে মোমের ওপর লিখত। ছড়ির অন্যপ্রান্ত হত থ্যাবড়া যা দিয়ে তারা লেখা মুছে ফেলতে পারতো। এই ধাতুনির্মিত ছড়িকে 'স্তিলুস' বলা হত। পাপিরসের ওপর লিখিত গ্রীক পুঁথিপত্র দেখতে লম্বা ফিতের মতো হত, গোল করে মুড়িয়ে তা রাখা হত। এইসব লিপিতে সেসময়ের জীবনধারার পাশাপাশি বহু পুরানো, দেবদেবী সম্বন্ধে জানা যেত।

প্রাচীন গ্রীক লিপি

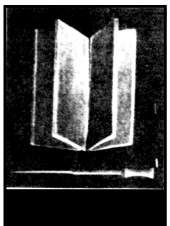

মোম দিয়ে পালিশ

মিশরীয়, চীনা, ইনকা ও আরো অনেক প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী মৃত ব্যক্তির কবরখানার পাশে মৃত্তিকাফলক, পাথর, হাড় প্রভৃতিতে লিখিত, বা খোদিত লিপি রেখে দিত। প্রত্নতাত্তিক খননকার্যের ফলে সেইসব কবরখানায় বিভিন্ন বস্তুর পাশাপাশি এসব লিপিও পাওয়া গেছে। তবে এখনও বহু লিপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং উদ্ধার হওয়া বহু লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাগুলি থাকবে না, যার ফলে পৃথিবী ও মানুষ সম্বন্ধে আরো অনেক অজানা তথ্য পাওয়া যাবে, অনেক বিতর্কিত তথ্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যাবে, যার ফলে মানব - ইতিহাসের মূল্যায়ন সহজতর ও আরো অনেক সঠিক হবে। ■

'বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের প্রচার'

মেঘনাদ সাহা

[বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী ড: মেঘনাদ সাহা এই রচনাটি লিখেছিলেন তাঁর কাজের ও মতের সমালোচকদের জবাবে। রচনাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ২৭ বর্ষ, সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬, ইং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মেঘনাদ রচনা সংকলন থেকে সংগ্রহ করে তা পুনরায় ছাপা হল। – সম্পাদক]

একথা না বলিলেও চলে যে, আধুনিক জগতে নানা কারণে বিজ্ঞানের বেশ খানিকটা মর্যাদা বা prestige বাড়িয়াছে। য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বৎসরে মানবের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে; এবং জ্যোতিষ, প্রাকৃত-বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণি ও উদ্ভিদ তত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনেক অ-বৈজ্ঞানিক লোক (অর্থাৎ যাঁহারা কখনও বিজ্ঞানের ধারাবাহিক শিক্ষার–discipline of science–ভিতর দিয়া যান নাই, অতএব যাঁহাদের বর্তমান বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বলিলেও চলে) নানা প্রকারে বিজ্ঞানের বাস্তব কৃতিত্বকে খর্ব করিতে প্রয়াস পাইবেন।

এই প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে নানা রূপ ধরিয়া। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান আর নূতন কি করিয়াছে ? বিজ্ঞান বর্তমানে যাহা করিয়াছে–তাহা কোনও প্রাচীন ঋষি, বেদ বা পুরাণ বা অন্যত্র কোথাও-না-কোথাও বীজাকারে বলিয়া গিয়াছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানব-সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিয়াছে, যথা– বিজ্ঞানের প্রসারে মানব-সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়িয়াছে, বিষাক্ত গ্যাস, বিস্ফোরক প্রভৃতি নানারূপ মানুষ-মারা জিনিস সৃষ্টি হইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানুষের ভোগলিপ্সা বর্ধিত করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্ন পথে লইয়া যাইতেছে। সমালোচক শ্রীঅনিলবরণ রায়ের রচনার মধ্যে এই 'ত্রিবিধ' মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধদ্বয়ে প্রথম শ্রেণীর সমালোচকদের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমালোচক অনিলবরণ রায় বর্তমান বিজ্ঞানের যে সমুদয় তথ্য, যেমন–'ক্রমবিবর্তনবাদ', 'জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার' ইত্যাদি–প্রাচীন শাস্ত্রে কোথাও-না-কোথাও বীজাকারে বা পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যে 'অলীক ও ভ্রান্ত' তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য, সমালোচক যদি বাস্তবিকই 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে'র সহিত প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচ্য-কার্যে ব্রতী হইতে চান তবে, তিনি ভাল করিয়া 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-এর সাধনা করুন, নতুবা 'অজ্ঞানকে বিজ্ঞান' বলিয়া প্রচারের অপচেষ্টা করা নিরর্থক এবং আমার মতে তাঁহার কোন 'অধিকার' নাই। পাশ্চত্য বিজ্ঞান অতি বিরাট জিনিস– প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত শাস্ত্র; ধ্যানে বসিয়া অথবা দুই-একখানা সুলভ বা popular বই পড়িয়া তাহাতে অধিকারী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঐ বিজ্ঞানের সাধানা করিতে হয় হাতে-কলমে, প্রণিধান করিতে হয় আজীবন স্বাধীন চিন্তায়, 'গুরু' বিজ্ঞানে 'পথপ্রদর্শক' মাত্র, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক গুরু যদি 'পূর্ণ ও চিরন্তন সত্য' আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। এক্ষেত্রে 'গুরুভক্ত'দের চেয়ে 'গুরুমারা' শিষ্যেরই আদর ও প্রয়োজনীয়তা বেশী। বিজ্ঞান কখনও চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে না, কিন্তু সাধকের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া তথ্য সন্ধানের পন্থা বলিয়া দেয়।

বিজ্ঞানের নামে সমালোচকের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তাহার অন্তর্নিহিত পাশবিক ভাবকে জয় করিতে পারে নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই মামুলী অভিযোগ আনিতে ছাড়েন নাই এবং অনেক গান্ধী-পন্থী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া চরকা,

গরুর গাড়ী ও বৈদিক তাঁতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক একটা অতি স্থূল কথা ভুলিয়া যান। বিজ্ঞান যে 'ব্যক্তিগত জীবন'-কে কতটা উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মোটেই কোন ধারণা নাই। দুই একটি প্রমাণ দিতেছি।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্ত হয় নাই, তথায় মানুষের গড়পড়তায় জীবনকাল সাড়ে তেইশ বৎসর মাত্র।* মধ্যযুগে অর্থাৎ–বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্বে য়ুরোপেও গড় জীবনকাল ছিল পঁচিশ বৎসর। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় মানুষের গড়পড়তায় জীবন বাড়িয়া প্রায় দুই গুণ অর্থাৎ–প্রায় ছচল্লিশ বৎসর হইয়াছে। 'বর্তমান বিজ্ঞান'-এর ভারতীয় সমালোচকগণ এই জীবন বৃদ্ধির কারণটা তলাইয়া দেখিবার বোধ হয় অবসর পান নাই। ইহার কারণ এই যে, বিজ্ঞানের প্রাসাদে য়ুরোপের অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর আবাস, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা, যথেষ্ট বিশ্রাম প্রভৃতি স্বাচ্ছন্দ্যের (amenities of life) অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু ভারত, চীন বা আবিসিনিয়ার গ্রামবাসী দুইবেলা উপযুক্ত আহার পায় না, তাহাদের শীত-গ্রীষ্ম-নিবারক বস্ত্রাদি নাই, বাসস্থান অতীব অস্বাস্থ্যকর, রোগে চিকিৎসক ডাকিবার ও ঔষধ কিনিবার সামর্থ্য নাই; এ জন্য অধিকাংশ স্থলেই তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকে বেশীর ভাগ অভাব, রোগ ও শোকগ্রস্ত হইয়া আধমরা হইয়াই থাকে।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, এদেশের লোকের বৎসরে মাথা পিছু আয় পয়ষট্টি টাকা মাত্র, কিন্তু বিলাতের লোকের আয় প্রায় মাথা পিছু দুই হাজার টাকা, অর্থাৎ–এখানকার প্রায় ত্রিশ গুণ। অনেকে বিলাতের সহিত তুলনায় আপত্তি করিবেন, কারণ বিলাতের উপনিবেশ আছে, আর আছে ভারত-মাতারূপ একটি কামধেনু। কিন্তু আর একটা পাশ্চাত্য দেশ লওয়া যাক, যেমন সুইডেন্। এই দেশের কোন উপনিবেশ বা অধীন দেশরূপ কামধেনু নাই; তাহা সত্ত্বেও এই দেশের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ভারতবাসীর গড় আয়ের প্রায় বিশ গুণ।* এমন কি, জাপান ভারত অপেক্ষা প্রাকৃতিক সম্পদে ন্যূন হইলেও বিজ্ঞান-সম্মত কার্য-পন্থা অবলম্বন করায় তথায় জনপ্রতি আয় গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা চারি হইতে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীন, ভারত ও আবিসিনিয়ার দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত দেশ (যে কারণেই হউক–আংশিক পরাধীনতা আংশিক ভ্রান্ত জনমত পোষণ) বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নাই এবং বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেই সম্পদ যথাসম্ভব সমভাবে বিতরণ করিবার চেষ্টা করে নাই। পক্ষান্তরে, ইংলন্ড ও অপরাপর য়ুরোপীয় দেশ নিজ নিজ যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করিয়া বৎসরে জনপিছু প্রায় দুই হাজার ইউনিট কাজ পাইতেছে; কিন্তু ভারতবাসী মোটের উপর নিজের শক্তি এবং দুই একটি গৃহপালিত পশুর শক্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া তাহার আয়ও পঁচিশ হইতে ত্রিশ গুণ কম হয়। একজন চরকাপন্থী বর্তমান লেখককে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, সারা বৎসর বিশ্রাম সময়ে চরকা কাটিয়া সাকুল্যে বৎসরে আয় হয় মাত্র চারি টাকা। চরকার নিরর্থকতা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানের প্রভাবেই প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া দেশের আয়বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে; এবং ব্যক্তিগত জীবনকে মধ্যযুগ (বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী যুগ) অপেক্ষা সর্বাংশে উন্নত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলা সুকর হইয়াছে।

যদি মানুষকে সর্বদা অভাব, অভিযোগ ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় তবে ইতর প্রাণীজীবনের উর্ধ্বে উঠিবার অবসর কোথায়? অধিকাংশ ঐতিহাসিকদিগের মতে যে সমস্ত জাতি বা সমাজ সভ্যতার উর্দ্ধতন শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপরাপর জাতি বা সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।* দার্শনিক গুরু প্লেটো বলিয়াছেন যে, এথেন্সের সর্বপেক্ষা গৌরবময় যুগে, অর্থাৎ – পেরিক্লিসের কালে, প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিকের গড়ে চারিজন ক্রীতদাস থাকিত; অর্থাৎ –নাগরিকদের অধীনে এক শ্রেণীর লোক ছিল যাহারা কৃষি, শিল্প, ভারবহন ইত্যাদি যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ করত এবং নাগরিকগণ শুধু তাহাদের কার্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিতেন। এজন্য নাগরিকগণ সুষ্ঠু কাব্য, দর্শন, স্থপতি ও কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। কিন্তু এথেন্স যখন মাকিদন্-রাষ্ট্রের অধীন হইল তখন এথেন্সবাসী নাগরিকদের অর্থ-সমস্যা আরম্ভ হইল এবং যে এথেন্স এককালে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সংস্কৃতিপ্রভাবে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিল তাহা অচিরে, অর্থাৎ এক শতাব্দীর মধ্যে, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নগরে পরিণত হইল।

কিন্তু বর্তমান সময়ে, অর্থাৎ–প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে নিয়োজিত করিয়া তাহার যাবতীয় কাজ করাইয়া লইতে পারে, ক্রীতদাস রাখার প্রয়োজন হয় না বলিলেও চলে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই প্রচেষ্টা চলিতেছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংলন্ডে বৎসরে জনপিছু কাজের পরিমাণ দুই হাজার ইউনিট–ইহার মধ্যে প্রায় ছয় শত ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে, প্রায় হাজার ইউনিট বাষ্পীয় শক্তি হইতে এবং অবশিষ্ট চারিশত ইউনিট পেট্রোল ও অপরাপর দাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন করা হয়। যদি উহার সমতুল্য পরিমাণ কাজ ক্রীতদাস রাখিয়া উৎপন্ন করা হইত, তাবে ইংলন্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যূন দশজন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত এবং প্রত্যেক ক্রীতদাসকে প্রত্যহ আট ঘন্টা পরিশ্রম করিতে হইত। কারণ, মানুষের কার্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত কম। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে দেখা গিয়াছে যে, একটি ঘোড়া দশজন মানুষের কাজের সমান কাজ করিতে পারে। একটি ঘোড়া এক ঘন্টা কাজ করিলে ৩/৪ ইউনিট কাজ হয়; সুতরাং, একজন লোক আট ঘন্টা খাটিলে, ত্রৈরাশিক পন্থায় দেখা যাইবে যে, মাত্র ৩/৪ x ৮/১০ অর্থাৎ– ৩/৫ ইউনিট কাজ করিতে পারে। যদি ধরা যায় যে, ক্রীতদাস বৎসরে তিন শত দিন কাজ করে, তাহা হইলে তাহার সারা বৎসরে কাজের পরিমাণ হয় ৩/৫ x ৩০০ অর্থাৎ– একশত আশী ইউনিট। অতএব দুই হাজার ইউনিট কাজ পাইতে হইলে ইংলন্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রায় এগার জন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত।

যদি পাঠকগণ এই সহজ হিসাবটি বুঝিতে চেষ্টা করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে কতটা সুন্দর পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে বিনিয়োগ করার ফলে প্রতি ইংল্যান্ডবাসী কম-বেশী দশটি ক্রীতদাসের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। শুধু তাই নয়, এই 'ক্রীতদাস'-কে বাধ্য রাখার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কার্যপন্থা সুনির্দিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র 'সুইচ', টিপিবামাত্র 'ক্রীতদাস' স্বতঃস্ফূর্তিতে কাজ করিয়া যায়। বেত্রাঘাতের বালাই নাই, পুলিশ বা সিপাহী মোতায়েন রাখিবার আবশ্যকতা নাই। ইংলন্ড, আমেরিকা ও জাপান এতটা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে এই প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগের ফলেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনও অনেক উন্নত স্তরে উঠিয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য, যদি এদেশের সুমহান অধ্যাত্মতত্ত্বের সাধকগণ এবং তথা গান্ধী-পন্থিগণ এই সামান্য তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন তবে আমাদের দেশ চরকা, গরুর গাড়ী, বৈদিক তাঁত ও প্রাচীন শাস্ত্রের মারাত্মক আধ্যাত্মিকতার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া ভবিষ্যতে মহীয়সী সভ্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ; যদি একটি সুচিন্তিত কার্যপ্রণালী স্থির করিয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের সর্ববিধ কার্যে প্রয়োগ করিবার দেশব্যাপী প্রচেষ্টা হয় তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনপিছু দ্বিগুণ আয় করা কিছু অসম্ভব নয়। 'জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি' সম্প্রতি এই কার্যপন্থা নির্দ্ধারণে নিযুক্ত আছেন।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে লোকের নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা অতি অল্পই ছিল, ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ধর্মী লোককে তাহারা বর্বর, অসভ্য ও পাপাসক্ত বলিয়া মনে করিত; এক দেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রসাদে পৃথিবীর অতি দূরতম দেশের মধ্যেও সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের লোক পরস্পর পরস্পরকে জানিতে শিখিয়াছে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনকে যতটা সুখী ও উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মনে করি। ■

*জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি'র বোম্বাই অধিবেশনে মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া এই সুন্দর যুক্তিটি উত্থাপন করিয়া কুমারাপ্পা মহাশয়কে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন; আমি এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরায়ার যুক্তিটি আরও বিস্তৃত করিয়া দেখিয়াছি।– লেখক।

*বিগত মহাযুদ্ধের পর কি করিয়া সুইডেন পরিকল্পনা করিয়া এত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে তৎসম্বন্ধে "ডিমোক্র্যাটিক প্ল্যানিং ইন সুইডেন" নামক পুস্তক, অথবা "সায়েন্স এন্ড কালচার" পত্রিকায় প্রকাশিত 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং ইন্ সুইডেন' প্রবন্ধ পঠিতব্য।– লেখক।

*অনেকের বিশ্বাস, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা তপোবনে বা অরণ্যে বিকশিত হইয়াছিল শহরে নয়; বর্তমানে লেখকের মতে এই ধারণা বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত। সহজেই প্রতীত হইবে যে, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তক্ষশিলা, বারাণসী, উজ্জয়নী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি সুবৃহৎ নগরে। প্রকৃত ইতিহাস না জানার ফলে প্রধানত কবি ও দার্শনিকগণ এইরূপ ভ্রান্ত মত সৃষ্টি করিয়াছেন।–লেখক।

ধারাবাহিক

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও বিজ্ঞান

ভূমিকার বদলে

বিজ্ঞান (এবং অবশ্যই প্রযুক্তি) এখন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে চূড়ান্ত বিশেষীকরণ করেও বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত তথাকথিত সভ্যতার এই শক্তিশালী হাতিয়ারকে বাগ মানানো যাচ্ছেনা।

বিজ্ঞানের জন্ম ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে হয়েছিল; বস্তুজগৎ থেকে যে চেতনার উদ্ভব হয়েছিল, সেইখান থেকে। অর্থাৎ সভ্যতার আদিতে বস্তুজগৎ তথা প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পরিবর্তন বা রূপান্তর মানব চেতনায় রেখাপাত করে, তাকে কৌতূহলী করে তোলে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানে। এই অনুসন্ধানের দুটি ধারাঃ

(ক) অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান ঃ যেমন আকাশে মেঘ করলে বৃষ্টি হতে পারে, বা কোনো বস্তু উপর থেকে নিচে পড়ে।

(খ) বস্তুকে ব্যবহার করতে করতে বিভিন্ন বিষয় বোঝা। যেমন, অসমৃণ তলের উপর দিয়ে কোনো বস্তুকে টানা শক্ত, বা দুটি বিশেষ পাথরকে ঠুকলে আগুন উৎপন্ন করা যায়।

বস্তুকে ব্যবহার করতে করতে মানব সভ্যতা উত্তীর্ণ হতে থাকে প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ, লৌহ যুগে। বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল যাত্রাপথে ঢোকার আগে বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। সাধারণভাবে বিজ্ঞান হল "প্রকৃতি ও বিশ্বের ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর সূত্র নির্ণয়, বস্তুর ধর্ম নির্ণয়, বস্তুজগৎ তথা প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে মানব জীবনের অনুকূলে আনা এবং চলমান পরিবর্তন ও বিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা।" বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বস্তুর পরিবর্তনের অতীত এবং ভবিষ্যৎ অবস্থান নির্দিষ্ট করতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়নি, ততদিন বিজ্ঞানের ফসল ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থে পরিচালিত হয়নি। যেমন উদ্ভিদ নিয়ে পর্যবেক্ষণের ফলে খাদ্য-অখাদ্য এবং ওষধি সম্পর্কে আবিষ্কারের সুফল সকলে ভোগ করতে পারতো। সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার ফলও ব্যক্তিগত দখলে চলে যায়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষে মানুষ যে দখলদারী কায়েম করেছে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে, তা পরিচালিত হয় শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষের হাতে। বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হল বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করা। বিজ্ঞানের প্রধান তিনটি শাখা, এখন আমরা যেমন দেখি – পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন এবং জীব বিদ্যা,সম্পূর্ণভাবে ছিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ নির্ভর এবং এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানের সম্পদ সংগ্রহ হতে থাকে ছোট-খাটো সরল যন্ত্রপাতি নির্মাণে যেমন, লিভার, চাকা, মাছ ধরার বঁড়শি, কৃষি বিদ্যা, ধাতু বিদ্যা। কালক্রমে গণিতশাস্ত্র উন্নত হলে বিজ্ঞানের সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হতে থাকে এবং প্রযুক্তি বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানও শক্তিশালী হতে থাকে।

শুধু অভিজ্ঞতা কোনো বিজ্ঞান হতে পারে না, যতক্ষণ না তাকে নিয়মবদ্ধ বা সূত্রবদ্ধ করা যাচ্ছে। মানুষ দেখেছে দুই ধরণের বস্তু আছে – (ক) নড়াচড়া করতে পারে না এমন, অর্থাৎ স্থির এবং (খ) চলাফেরা করতে পারে এমন। মোটা দাগের এই পর্যবেক্ষণে আরও নির্দিষ্ট হয়েছে যে অনেক বস্তু নড়াচড়া করলেও তাদের নিজেদের ইচ্ছা বলে কিছু নেই যেমন - হাওয়া বয়ে গেলে জলে আলোড়ন ওঠে। আবার গাছপালা এক স্থান থেকে অন্যত্র যেতে পারে না, কিন্তু তাদের আকার-আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেই চলে এবং ফুল ফল, পাতা ঝরা, পাতা গজানো প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে থাকে। এইভাবে জীববিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে থাকে।

পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান মানব বিকাশের দুটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দিল – ১) জীবনকে সুবিধাজনক বা প্রকৃতির অনুকূলে আনার উপায়-উপকরণ নির্মাণ, এবং ২) তাদের বিকশিত করে তোলা।

এই দুটি কাজের প্রথমটি জীবনের স্বাভাবিক ও প্রাথমিক চাহিদার থেকে উদ্ভুত। যেমন - নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য সংগ্রহ, শীতের জন্য গাত্রাবরণ, আত্মরক্ষা অথবা শিকারের অস্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি।

দ্বিতীয়টি আসে প্রকৃতি ও বস্তুকে ব্যবহার করতে করতে যে চেতনা আসে তার তাড়নায়। যেমন - জলস্রোতে গাছের পাতা ভেসে যায়, তাহলে ভেলা বানিয়ে জলস্রোতকে কাজে লাগানো যায়, আরও উন্নত "নৌকা" বানানো যায়।

একদিন, দুদিনের জন্য নয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিজ্ঞানের এই উত্তরাধিকার মানুষ বয়ে চললো সভ্যতা বিকাশের স্বার্থে। তারপর এলো ব্যক্তি মালিকানার যুগ, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। নিপীড়িত মানুষের শ্রম এবং ব্যক্তি স্বার্থে নির্দেশিত বিজ্ঞান গবেষণা গড়ে তুলতে লাগলো সভ্যতার বুনিয়াদ। ক্ষমতাবান

ও অর্থবান শ্রেণী বিজ্ঞানের সুফলগুলি ভোগ করতে লাগলো, বিজ্ঞান চর্চায় নিয়ত তপস্বী বিজ্ঞানীরা বিক্রিত হতে লাগলো অথবা শৃঙ্খলিত হল শ্রেণী বিশেষের কাজে। আর সাধারণ মানুষের কাছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলেও, অনিবার্যভাবে, বিজ্ঞানের ফসল আসতে লাগলো।

একসময় বিজ্ঞান পরিচালিত হতে থাকলো রাজানুকূল্যে এবং রাজ প্রদর্শিত ধর্মীয় বাতাবরণে। ধর্ম যতদূর অনুমোদন করবে ততদূরই বিজ্ঞান বিকশিত হবে এবং গবেষণা চলতে পারবে। ধর্মীয় অনুশাসন বিরোধী বিজ্ঞান চর্চা করলে বিজ্ঞানীদের হত্যা পর্যন্ত করা হত। তবু সেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য থেকেও বিজ্ঞান বিকশিত হয়েছে এবং আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে, যে যুগের মূলমন্ত্র হল ব্যবসা। দেশে দেশে শিল্প-বিপ্লব এনে দিল বিজ্ঞান গবেষণার আরও সুযোগ।

ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ছাড়া শুধু বিজ্ঞানের তত্ত্ব সভ্যতা বিকাশের হাতিয়ার হতে পারে না। সভ্যতা ও বিজ্ঞান সমার্থক হয়ে গেছে। বিকাশের প্রধান বিষয়গুলি – যোগাযোগ ব্যবস্থা, শক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা, এবং অবশ্যই অস্ত্র উৎপাদন চলে গেছে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর হাতে। তারা রাষ্ট্র শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাদের মতো আইন তৈরী করে নিয়েছে বিজ্ঞান ও তার ফসলকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে। সুতরাং আর্কিমিডিসের যুগান্তকারী উদ্‌স্থিতি বিদ্যার তত্ত্ব কাজে লাগিয়েছে "জাহাজ ব্যবসায়ীরা", জেমস ওয়াটের বাষ্পশক্তির গবেষণা (ষ্টীম ইঞ্জিন) ব্যবসা বাড়িয়েছে কারখানা মালিকদের, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু বিনিদ্র রজনীর গবেষণা ব্যবসা বাড়িয়েছে ঔষধ কোম্পানীগুলির; রসায়নশাস্ত্রের গবেষণা জীবনের প্রায় সমস্ত ব্যবহারিক বস্তুর উৎপাদনের (রঙ প্রসাধন, প্লাস্টিক ও পলিথিন, বস্ত্র উৎপাদন) বিশাল ব্যবসা ফেঁদেছে।

বিজ্ঞানী এডিসন, ভোল্টা বা ডেভী কি কল্পনা করেছিলেন তাঁদের তড়িৎ বিজ্ঞান, তড়িৎ শক্তি, ব্যাটারী বা তড়িৎযন্ত্র কোটি কোটি টাকার ব্যবসা এনে দেবে ! দেশলাই বা কাগজের মতো অতি সাধারণবস্তুও কোম্পানিগুলির মুনাফার পণ্য!

এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়টি হল, মানুষের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান বিশেষ শ্রেণীকে ক্ষমতাবান করে তুলেছে এবং মূলতঃ ও প্রাথমিকভাবে সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। এর ফলে বিজ্ঞানের বিকাশ সামাজিকভাবে মানুষকে উন্নত করলো না, তৈরী করলো অর্থ ও ক্ষমতা কামানোর কেন্দ্র। কঠোর ধ্যান ও গবেষণালব্ধ আবিষ্কার চলে গেল শ্রেণী শোষণের কাজে, উৎপাদনের উপায় উপকরণের মালিকদের কাছে। সামাজিক স্বার্থে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হলে অন্নের অভাবে, ঔষধের অভাবে, মারণাস্ত্রের আঘাতে মানুষ মারা যেত না। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিজ্ঞান ক্ষমতাসীন শ্রেণীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না (চলবে) ■

বন্যা এবং বহুমুখী নদী প্রকল্প

– অনিকেত

এবারে বর্ষা খুব জোরদার। এসেই ভাসিয়ে দিয়েছে গ্রামগঞ্জ এমনকি নাস্তানাবুদ শহর কোলকাতাও।

"বীজ বুনেছি আষাঢ়ে
আনব ভাদু* ভাদ্দরে
দামোদরে জল যেনেছে
নৌকা বাওয়া যায় নারে
ও দামোদর পায়ে পড়ি
জল কমা তোর এইবারে
বছর ঘুরলে ভাদু আসে
নৌকা বাইতে দেনা রে"

প্রবল বৃষ্টি – অতঃপর বন্যা কেড়ে নিয়েছে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য।

দামোদর উপত্যকার মানুষ জনের মধ্যে এক সময় এই গানটা প্রচলিত ছিল। আর দামোদরের নাম ছিল দুঃখের নদী। দামোদরের বুকে বাঁধ নির্মানের পর কয়েক বছর এই বদনাম ঘুঁচেছিল।। কিন্তু আবার যে কে সেই। দামোদরের বুকে জমা পলি নদীর অধিক জলধারণের ক্ষমতা হরণ করেছিল বলেই নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বর্ষার সময় প্লাবিত

** ভাদু মূলত ঃ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার উৎসব। ভাদুকে দেবী লক্ষীর প্রতিমূর্তি বলে মনে করা হয়।*

হত। কিন্তু বাঁধ বেঁধে সে সমস্যার সমাধান হল কই ?

মনে আছে ছোটোবেলায় পাড়ায় একবার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে একটা গানের দল অন্যান্য গানের সঙ্গে গেয়েছিল ...

"কেন খরা ও বন্যা আসে বছর বছর
দাও আজ জবাব দাও
কেন বানে ভাসে ভিটে মাটি গ্রাম ও নগর
দাও আজ জবাব দাও।"

ভয়ঙ্কর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাদের। খরা ও বন্যার জন্য কে জবাব দেবে ? এটা কি মানুষের তৈরী !

পরবর্তীকালে এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলেও ফেলেছিলেন - খরা ও বন্যা 'Man made' -

নদীতে বাঁধ দেওয়া, বড় বড় জলাধারে জল ধরে রাখা, নদীতে খাল কেটে খেতে জল দেওয়া, সে আজকের ব্যাপার নয় - প্রায় ১ম শতাব্দী থেকে সেই কাজ চলছে এদেশে, তথা সারা পৃথিবীতে কিন্তু এগুলি প্রত্যেকটিই ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের পরেই জল সম্পদের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে এবং ব্যাপক বন্যা নিয়ন্ত্রণের সংকল্পে বহুমুখী নদী প্রকল্পের আবির্ভাব, যাতে উল্লিখিত সমস্ত সুযোগ সুবিধাই এই প্রকল্প থেকে পাওয়া যায়। শুরুটাও সেইভাবেই হয়েছিল।

বহুমুখী নদী প্রকল্পতে নদীর উপর বাঁধ দিয়ে জলধার বা কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল ঃ

১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ - নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে জলের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে বন্যা নিবারণ সহজসাধ্য করা;

২) জলাধারগুলো থেকে খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা;

৩) জলাধারগুলো থেকে সুড়ঙ্গের মধ্যে জল ছেড়ে ওই জলের প্রচন্ড গতিবেগকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা;

৪) কৃত্রিম হ্রদে মৎস্যচাষ করা;

৫) বাঁধ অঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভুমিক্ষয় রোধ করা;

৬) বাঁধগুলো নদীর উপর সেতুর কাজে লাগে;

৭) এছাড়া বিভিন্ন জলাশয়, খাল প্রভৃতির সাহায্যে লোক সমাজের অমোদ-প্রমোদ, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতি হয়ে থাকে।

এই নিরীখে ভারতে স্বাধীনতার পরে নিম্নলিখিত বহুমুখী প্রকল্পগুলি তৈরী হল –

প্রকল্পের নাম	নদী	উপকৃত রাজ্যসমূহ	নির্মানের তারিখ
ভাকরা নাঙ্গাল	শতদ্রু	পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান	১৯৬৩
দামোদর ভ্যালি	দামোদর	ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ	১৯৫৩
কোশী	কোশী	বিহার	১৯৬৩
হিরাকুঁদ	মহানদী	উড়িষ্যা	১৯৬৬
তুঙ্গভদ্রা	তুঙ্গভদ্রা	কর্নাটক, অন্ধ্র	১৯৫৩
নাগার্জুন সাগর বাঁধ	কৃষ্ণা	অন্ধ্র প্রদেশ	১৯৭৪
রিহান্দ	রিহান্দ	উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খন্ড	১৯৬১
তেহরি	ভাগিরথী	উত্তরাঞ্চল	১৯৬১
চম্বল	চম্বল	রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ	১৯৬০
ইন্দিরাগান্ধী ক্যানাল	শতদ্রু, বিপাশা	রাজস্থান	১৯৮৬

বহুমুখী প্রকল্পের অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন জলসেচ এগুলো হলেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ একেবারেই সম্ভব হচ্ছেনা, বিপরীতে বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়াত পরিবেশবিদ অনিল আগরওয়ালের মতে, "The Government's anti flood measures have actually boomeranged. Dams and embarkments have now become an important cause of floods."

বন্যা নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার কারণ –

প্রকল্পগুলির মাধ্যমে নদীর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে - ফলে জলবাহিত নুড়ি, পাথর, মাটি স্বাভাবিক নিয়মে বয়ে যেতে পারছেনা – কৃত্রিম হ্রদ বা জলধারগুলিতে গিয়ে জমা হচ্ছে। ফলে জলাধারগুলির নাব্যতা কমে যাচ্ছে। বর্ষায় সময় প্রবল বৃষ্টিপাতে জলাধারগুলির ধারণ ক্ষমতার উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর জল না ছেড়ে দিলে বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা লক্ষাধিক বেড়ে যাবে। তাই ক্ষতিটা যাতে অল্প হয় সেই ভাবে জল ছাড়া হয় আর তাতেই বানভাসি হচ্ছে অসংখ্য মানুষ প্রায় প্রতি বছর।

শেষাংশ ২৭ পৃষ্ঠায়

বলির পাঁঠা

আজ রাজুর মনটা খুব খারাপ। কাল রাতে বউ-এর সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে। ঘুম হয়নি। তাই সকাল বেলায় বউ-এর কথায় কান না দিয়ে, ভ্যান রিক্সা নিয়ে সোজা রাস্তায় এসে হাজির। সামান্য কিছুক্ষণ যাত্রীর অপেক্ষায় থেকে অস্থির হয়ে ওঠে সে। প্রতিদিনই যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু আজ যেন এক মিনিটের দৈর্ঘ্য বেড়ে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। বন্ধু কমলের পরামর্শে বটতলা থেকে একটা পাঁইট এনে গলায় ঢেলে দিয়ে মনটা জুড়ানোর চেষ্টা করে।

দুই-এক টিপ খাটার পর হঠাৎ-ই তার ফেরিওয়ালা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। তার ভ্যান রিক্সায় যাতায়াত করতে করতে ফেরিওয়ালাটি তার বন্ধু হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম রাজু এই ফেরিওয়ালাটিকে "বাবু" বলত। সম্পর্ক ঘনিষ্ট হওয়ার পর দুজনার মধ্যে "দাদা" আর "রাজু" সমঝোতা হয়েছে। দেখা হলেই, দুজনার মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা ভাগাভাগি হয়। আজ রাজু বলতে শুরু করে – "দাদা কাল রাতে বউটার সাথে খুব ঝগড়া হয়েছে। গত সপ্তাহে আমি দুটো খাসি আর একটা পাঁঠা বিক্রী করেছি মোট নয় হাজার টাকায়। পাঁঠাটা মানসিকের বলি দেবে বলে আড়াই হাজার টাকায় কিনেছে। পাঁঠাটার গায়ে এক জায়গায় সাদা দাগ ছিল। ঐ সাদা জায়গায় চুল রং করার মেডিসিন দিয়ে কালো করে দিয়েছিলাম বলেই আড়াই হাজার টাকা দাম পেয়েছি। কাল রাতে বউকে কথাটা বলতেই – বিপদ। বউ বলছে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তি করার জন্য ছোটো পাঁঠাটাকে মা কালীর নামে মানত করতে। আমি বলেছি – "মা"-এর নামে সোয়া সিকি তুলে রাখতে। তা সে রাজি হবে কেন ? আচ্ছা দাদা তুমিই বলো, যা দিনকাল পড়েছে - একটু আধটু পাপ না করলে বাঁচা যায় ? তবে, কাল কিন্তু বউ-এর গায়ে হাত তুলি নি।"

ফেরিওয়ালা দাদা -তুমি, বউকে মারো নাকি ?

রাজু - আগে তো রোজই মারতাম।

দাদা - কেন ?

রাজু - এই দ্যাখো। বউকে না মারলে ঠিক থাকে। সবাই মারে, সবাই। এটাই নিয়ম গো দাদা, এটাই নিয়ম।

দাদা - তা কাল মারলে না কেন ?

রাজু - সে বলতে গেলে অনেক কথা। তা প্রায় এগারো বছর হল মারা ছেড়ে দিয়েছি।

দাদা - কিন্তু কেন ?

রাজু - আজ থেকে এগারো বছর আগে, আমার একটা বড় অপারেশন হয়েছিল, নীল রতন হাসপাতালে। সাড়ে তিন মাস আমি ভ্যান চালাতে পারিনি। আমাদের তো রোজ না বেরলে খাওয়া জোটে না। সেই সময় কাননকে দেখেছি কিভাবে সংসারটা চালিয়ে নিয়ে গেল। জলা থেকে কলমি শাক তুলে আনা, ছাগলের জন্য ঘাস-পাতা কেটে আনা, ছেলেটাকে সময় মতন স্কুলে পাঠানো, আমাকে সময়ে সময়ে খাওয়ানো, স্নান করানো,..... । আবার মেয়েটিকে ঐ সময় জোর করে স্কুলে ভর্তি করল। কানন বলেছিল, স্কুলে ভর্তি করলে, ছেলে-মেয়ের দুপুরে খাওয়াটাতো নিশ্চিন্তি। আমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করার জন্য মাঝে মধ্যে এর-ওর পুকুর থেকে মাছ চুরি করে আনত। এসবের পরেও, রাতের বেলায় আমাকে........ ।

দাদা - মাছ চুরি করাটাও তো পাপ।

রাজু - সে কথা তো কাল কত করে বোঝালাম। কিন্তু কে বোঝে ! বলে কিনা বলির পাঁঠায় মেডিসিন দেওয়াটা বড় পাপ।

আচ্ছা, দাদা, - সোয়াসিকির মানত, "বড় পাপ"-কে ছোটো করবে না ?

রাজুর এই পাপ পুণ্যের ভারসাম্য রক্ষা করার পদ্ধতি জানা না থাকায় - দাদা নিরুত্তর।

রাজু - বুঝেছি, খুব গন্ধ লাগছে - তাই না ?

এখুনি ব্যবস্থা করছি।

হঠাৎ, ভ্যানটা দাঁড় করিয়ে, পানের ডিবে থেকে একটা জর্দা পান মুখে দিয়ে চিবোতে লাগল।

বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে সুরা-জর্দার যৌথ প্রচেষ্টায় রাজুর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এল –

দাদা, ঐ অপারেশনটার পর আবার ভ্যান চালাতে শুরু করলাম - শুধু রাতে একটা করে পাঁইট খাই – তাও ছেলে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে। কাননকে আমি খুব ভালোবাসি। আমি শুধু ভ্যান চালাই আর খাই। কাননকে রোজ পয়সা জমা করে দিই। শহরের মেয়ে-বাবুরা যে চুল কালো করে – তাতে পাপ হয় না ? পাঁঠাটাকে মেডিসিন দিয়ে কালো করেছিলাম বলেই না – মা কালীর পায়ে গেল। ঐ পাঁঠার পুণ্যি থেকে আমি কি একটুও ভাগ পাব না ?

দাদা - রাস্তাটা দেখে, ভ্যান চালাও।

রাজু কিন্তু শুনতেই পেল না। বলেই চলল – বউটা আমার বড় ভালো। আমি যদি কোন পাপ করে থাকি - তবে তা বউকে মেরেই করেছি। মানত যদি করতেই হয়, ঐ জন্যই করব। দাদা, সব শুনছো তো ? বিচার একটা দিতে হবে কিন্তু।

দাদা - হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রাজু - মেয়েটা, আমার সেয়ানা হচ্ছে। বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে হলে, প্রথম প্রথম তাকেও জামাই-এর কাছে মার খেতে হবে রোজ। কিন্তু জামাই-এর যদি কোন অপারেশন না হয়, তবে তো মেয়েটা সারা জীবন মার খেয়ে মরবে।

- শ্যালা, জামাই-এর একদিন অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে দেব। তারপর – জামাই ঠিক মেয়েকে ভালোবাসবে, আর মারবেনা। দাদা - অ্যাক্সিডেন্টে জামাই যদি মরে যায় ?

রাজু - তবে কি আমার পাপের ফলটা, আমার মেয়ে ভোগ করবে ? কি করি বলো তো ?

দাদা - তোমার ছেলে যদি, তোমার বউমাকে পেটায় ?

রাজু - না, কক্ষনো না। তা আমি হতে দেব না। আমি-কানন দু-জনা মিলে ছেলেকে মারব।

দাদা - তোমার মতন প্রত্যেকে যদি, ঘরের বউ, বউমাদের গায়ে হাত না তোলে, তবে তোমার মেয়েরও মার খাওয়ার ভয় থাকে না।

রাজু - তা, আবার হয় নাকি ? গ্রামের প্রায় বাড়ীতেই বউকে মারে।

দাদা - জামাই যদি, তোমার মেয়েকে মারে, তবে জামাই এর নামে একটা 498(A) ঠুকে দেবে। বুঝবে ঠেলা –

রাজু - সেটা আবার কি ? কোন ঠাকুরকে দিতে হয় ?

দাদা - আরে সেটা একটা আইন। এই আইনে, পুলিশ তোমার জামাইকে অ্যারেস্ট করে জেলে পাঠিয়ে দেবে। তারপর ৯০ দিন জেলের ঘানি টেনে - বাবাজীবন সুর সুর করে তোমার মেয়ের পায়ে এসে পড়বে।

আইন, জেল, পুলিশ শুনে রাজুর ঘোর কখন কেটে গেছে – তা রাজু নিজেই জানে না। দু-কাঠা জমির জন্য চৌদ্দ বছর ধরে, কোর্ট-পুলিশের অভিজ্ঞতার কথা রাজুর মনে পড়ে যায়। সেই দু কাঠা জমি থাকলে মেয়ের বিয়েতে কাজে লাগত। কোর্ট-উকিল-পুলিশ না থাকলে সে হয়তো আরও দু কাঠা জমি কিনতে পারত। এ সব ভাবতে ভাবতে রাজু বলল – মন ভাঙ্গলে আবার ঘর হয় নাকি ?

দাদা - আরে বাবা, আইন অনেক শক্তপোক্ত জিনিস। আইনে ঘর করবে। আর ঘর না করলে, তোমার মেয়েকে মাসে মাসে টাকা দেবে।

রাজু - এতো, ঘর-ভাঙ্গা আইন গো, দাদা। না, দাদা না, আমি মেয়ের ঘর ভাঙ্গতে চাই না।

ফেরিওয়ালা বন্ধুর বহু ভারি ভারি কথার মানে, রাজু অনেক সময় বুঝতে পারে নি। কিন্তু, কাননের ভালোবাসার অভিজ্ঞতায় রাজু আজ সার বুঝেছে যে, আইন দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখা যায় কিন্তু ঘর-বাঁধা যায় না। ■

তরমুজের স্বাদ নোনতা

মাঠে ছাগল চড়াচ্ছিল দুই বন্ধু। পরণে তালি দেওয়া রঙচটা ফ্রক, একজনের আবার বোতাম ছেঁড়া। উস্কো-খুসকো চুল, কতদিন তাতে তেল-সাবান পড়েনি কে জানে ! গ্রামের স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ে দুজন। পড়াশুনায় মন নেই, তার জন্য বকেও না কেউ। পড়াশুনার চেয়ে দুপুরের খিচুড়িটার প্রতিই ওদের বেশি টান। তাই যেদিন ইস্কুল থাকে না, মনও ভালো থাকে না। কুলসুম সহরবানুকে বলছিল "কাল ইন্দ্রানী দিদিরমণির শাড়িটা দেখেছিস, কি সুন্দর মানিয়েছিল বল।"সহরবানু যেন সে কথা শুনেও শুনতে পেল না। ওর চোখ বাজারের দিকে। সে বলল "দেখ কুলসুম বাজারে কত তরমুজ এসেছে। একবার রোজার সময় আব্বা এনেছিল, কি সুন্দর খেতে।" দিদিরমণির রঙীন শাড়ির কথা ভুলে কুলসুম ওদিকে তাকায়। সেও একবার তরমুজ খেয়েছে, হিঁদুদের পুজোর প্রসাদে। হঠাৎ তারও লোভ হল। ভাবল আজ আব্বাকে বলবে। তারপরই মনে পড়ল ভোরবেলার ঝগড়াটা কথা। মা নানির বাড়ি যাবে বলে ৫০ টাকা চেয়েছিল, তা শুনে আব্বা রেগে আগুন। আব্বার নাকি অনেক দেনা। দিদির শাদির সময় করা দেনা এখনও মেটেনি। রাজমিস্তিরির জোগারের কাজ করে শুধবে ভেবেছিল। রোজ কাজই হচ্ছে না, বসে খেলে দেনা শুধবে কবে, আর সংসার চালাবে কিভাবে। ভাবতে ভাবতে কুলসুমের মনটা ভারী হয়ে গেল। ছাগলগুলো খোঁটায় বেঁধে দুই বন্ধুর 'ফিসফিসানি' শুরু হল। বুক দুরদুর করলেও মিষ্টি তরমুজের পানি ওদের তুলসীহাটা বাজারের দিকে নিয়ে চলল।

এবার তরমুজের ভাল ফলন হয়েছে মালদহ জেলায়। জোগান ও চাহিদার দ্বন্দ্বে এক কোণে টিপি হয়ে আছে সরস ফলগুলি। আড়তদাররা অপেক্ষায় আছে কখন চাষীরা হাল ছেড়ে কম দামে বেচবে সেগুলো। কত পুঁজি লাগিয়ে গতরে খেটে ফলিয়েছে ওই ফসলগুলো। তারপর এতগুলো টাকার ভ্যানভাড়া। বেলা বাড়ছে। অধৈর্য্য চাষীরা তবুও অপেক্ষায়, দাম বাড়ার।

টিপি করা ফসলগুলোর দিকে কারও তেমন নজর নেই, এই ভেবে দুই বন্ধু তরমুজের টিপির কাছে নিঃশব্দে পৌঁছে গেল। নয় বছর বয়সী শীর্ণ চেহারার মেয়েদের পক্ষে যতবড় সম্ভব, সবুজ ফলটি তুলে নিয়ে দে দৌড়।

অসম্ভব বিরক্তি আর একরাশ চিন্তা নিয়ে বসে থাকা চাষীদের নজর পড়ল সেদিকে। সমস্ত ক্ষোভ আর বঞ্চনা উগড়ে দিলে ওই ছোট্ট শিশু দুটির উপর। রশি দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে নিয়ে, চলল গণপিটুনি। সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেল সহরবানু, পারেনি কুলসুম। চুরি করা সাধের তরমুজটাও ভাঙা হল তার মাথায়। কুলসুমের শরীরের নোনতা রক্ত তরমুজের মিষ্টি লাল পানিকেও বিস্বাদ করে দিল।

ছাগল চড়াতে আসা অন্য কয়েকটি ছেলে এসব দেখে ছুটে গিয়ে খবর দিল কুলসুমের মা আর আব্বাকে। ছুটে এলেন তারা। হাতে পায়ে ধরে ছাড়িয়ে নিলেন মেয়েকে। ঘরে গিয়ে নেতিয়ে পড়ল মেয়েটি। তারপর চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। দিদিমনির রঙীন শাড়ি, মিড ডে মিলের খিচুড়ি বা বাজারের মিষ্টি তরমুজ সব কিছুর লোভ থেকে 'চোর' বদনাম নিয়ে সে চিরবিদায় নিল।

এর পরের খবরে কোন নাটকীয়তা নেই। পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চাঁচাল মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সন্দীপ মন্ডল বলেছেন 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' বি ডি ও এবং স্থানীয় বিধায়ক এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পরদিন খবরের কাগজে শোকার্ত পরিবারের কান্নার ছবি ছাপা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুলসুম চলে গেছে। তার বন্ধু সহরবানুর মত লক্ষ লক্ষ ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এখনও মরে বেঁচে আছে। চারদিকে প্রচুর ভাল ভাল খাবার, সুন্দর সুন্দর জামা, জুতো, খেলনা পড়ে আছে। এসবে ওদের কোন অধিকার নেই। কারণ ওদের মা-বাবার পকেটে পয়সা নেই। কুলসুমের মৃত্যু কি ওদের মনের কোণে এসবের প্রতি লোভ-লালসা মিটিয়ে দেবে ? তা যদি হত, তবে ওদের ভবিষ্যতে চোর বদনাম নিয়ে মরার ভয় থাকত না। কিন্তু কে যেন বলেছিল – খিদে একটি বিষম বস্তু.....।

পরিযায়ী

– সোমা শীল

নীল সাগরের ওপার থেকে
এসেছে একদল পাখী,
বেঁধেছে অস্থায়ী বাসা
বাড়িয়েছে বন্ধুত্বের হাত;
জীবনের কি অপূর্ব আস্বাদ!

তারা শেখায় স্বাধীন বুলি,
বোঝায় মুক্ত হাওয়ায় তাদের বাস,
চাইলে করতে পারে প্রতিবাদ।

আমরা শুধু মাথা কুটে মরি;
অপর তো বটে, নিজের কাছেই হারি।
জেগে থেকেও ঘুমের ভান ক'রে
জাগানো কি যায় অপরের মন?
মনের কথাই বলিনি যখন
শেখানো বুলি ধরে রাখতে পারে কি মন?

তবুও যদি –
নিয়ম করে শিখতে পারি
নিয়ম ভাঙার রীতি।
মোরাও তখন দেশ-বিদেশে
মুক্তি স্রোতে আনব গতি।

চিঠিপত্র

প্রতি সম্পাদক,
সমীক্ষণ,
কলকাতা

সাথী,

আপনাদের প্রকাশিত সমীক্ষণের দুটি সংখ্যাই পড়েছি। বিজ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে 'বিজ্ঞান মনস্ক' সংগঠনের প্রয়াসকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমীক্ষণের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত সাপ সম্পর্কিত দুটি নিবন্ধে কিছু ভ্রান্তি নজরে এসেছে। শ্রেয়া চক্রবর্তী লিখিত (পৃ - ১৮) সাপের সাত কাহন নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে "সাপ কোনো তরল পদার্থ পান করতে পারে না।" প্রকৃতপক্ষে সাপ মুখের নিচের অংশটাকে জলে ঠেকিয়ে সহজেই জল পান করতে পারে এটা আমার অভিজ্ঞতা। তবে সাপ কোনো কিছু চুষে খেতে পারে না। কারণ সাপের মুখের গঠন চোষার জন্য অভিযোজিত হয় নি। সাপ তরল পান করতে পারে না বললে ভুল হবে।

একই লেখার পরের অংশ থেকে মনে হয় সাপের বুঝি দুটি মাথা হতে পারে না। আসলে কখনো কখনো সাপের দুটি মাথা দেখা যায়। নিষেকের পর ভ্রূণের বিকাশের সময় গড়মিল হলে একই সাপের দুটি মাথা পরস্পর জোড়া লাগানো অবস্থায় দেখা যায়।

পরবর্তী নিবন্ধ "সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি"। তাতেও অনুরূপ কিছু ভুল রয়েছে। এই লেখায় (২৪ পৃ) বলা হয়েছে "কেউটের কামড়ে বিষথলি ২/৩ (দুইয়ের তিন) অংশ বিষ বেরিয়ে আসে কিন্তু চন্দ্রবোড়ার কামড়ে বিষথলির সবটুকু বিষ বেরিয়ে আসে"। এটা ভুল। কোনো সাপের বিষই একবারের কামড়ে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারে না এমনকি জোর করেও তা করা যায় না। চন্দ্রবোড়া সাপ একজনকে কামড়ে, কিছুক্ষণ পরে আরেকজনকে কামড়ালে বিষ ক্রিয়া অবশ্যই হবে।

এই নিবন্ধের অন্য অংশে বলা হয়েছে "শিকার ধরার সময় সাপ বিষ দাঁত ব্যবহার করে না।" এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে তখন বিষ দাঁত কোথায় যায়, যদি উত্তর হয় বিষ দাঁত ভাঁজ করে নেয় তাহলে আমি বলব সেটা কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক ভাইপার (বোড়া) সাপের ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব। বাকি কেউটে থেকে শুরু করে সামুদ্রিক সাপ কেউ বিষ দাঁত ভাঁজ করতে পারে না। সাপ শিকার ধরা ও আত্মরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই বিষদাঁত ব্যবহার করে। ভাইপারের শিকার ধরার কৌশল দেখলে এটাই সবাই বুঝতে পারবেন।

আরেকটা ক্ষেত্রে বলা হয়েছে চন্দ্রবোড়া (রাসেল ভাইপার) "ক্ষীণ-বিষ" সাপ। এটা ভুল তথ্য। আসলে চন্দ্রবোড়ার মতো মারাত্মক বিষাক্ত সাপ ভারতে কমই পাওয়া যায়। এই সাপটি হিমোটক্সিক ক্যাটাগরীর বিষাক্ত। প্রতি বছর ভারতে এর কামড়ে অনেক লোক মারা যায়। এক্ষেত্রে সকল সামুদ্রিক সাপকেই নির্বিষ বলা হয়েছে। এটা ভুল তথ্য এবং এটা লেখার অন্যত্র স্বীকার করা হয়েছে। পৃ: সংখ্যা ৩০-এ আবার বলা হয়েছে সকল সামুদ্রিক সাপই বিষাক্ত। প্রকৃতপক্ষে বেশীরভাগ সামুদ্রিক সাপই বিষাক্ত।

এই নিবন্ধেই বলা হয়েছে সাপে কাটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে "অ্যান্টি ভেনাম প্রয়োগের পূর্বে যে ক্ষতি হয় তা আর সারানো সম্ভব হয় না" – এটা নিউরোটক্সিক বিষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? একথা স্পষ্ট করা দরকার। কারণ এই বিষে আক্রান্ত ব্যক্তির ফুসফুসে পক্ষাগাত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়ে যায়, কিন্তু অ্যান্টি ভেনাম সময় মতো পড়লে আবার রোগী বেঁচে যায় – এটাও অভিজ্ঞতা।

চিঠিতে যে বইগুলি থেকে তথ্য সংযোজিত হয়েছে সেগুলি হল (১) সাপ কিংবদন্তী ও বিজ্ঞান – মরুৎ দেব (২) কিংবদন্তীর নায়ক সাপ – বিকাশ কান্তি সাহা (৩) সাপের ডায়েরী (৪) সাপ – সাপ – কমল বিকাশ বন্দোপাধ্যায় (৫) আমাদের আশেপাশে – জয় ও রম হোয়াইটেকার।

সাপ বিষয়টি আমার কাছে বরাবরই কৌতূহল উদ্রেককারী এবং নিজেও সাপ নিয়ে কাজ করি। ফলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়ে আমাকে ও পাঠকদের আলোকিত করবেন এই বিশ্বাস।

অভিনন্দন সহ
চীরঞ্জীব দেবনাথ
পদ্মপুর, ধর্মনগর, উ: ত্রিপুরা

সম্পাদকের জবাব

মাননীয়,
চীরঞ্জীব বাবু

আপনার প্রেরিত পত্রের জন্য, 'সমীক্ষণ'-এর পক্ষ থেকে আপনার উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই। সমীক্ষণের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, "সাপের সাত কাহন" এবং "সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি" নিবন্ধ দুটির ত্রুটি প্রসঙ্গে আপনার চিহ্নিত চিত্রন আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এভাবেই তো জানা বোঝার গোলকের ব্যাসার্ধের পরিবর্তন ঘটে।

আপনি যে ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছেন সে প্রসঙ্গে আসা যাক –

(১) "সাপের সাত কাহন" নিবন্ধের ২ নং পয়েন্টে বলা হয়েছে "সাপ কোন তরল পদার্থই পান করতে পারে না।" এই বক্তব্যটি উৎস মানুষ সংকলিত, "সাপ নিয়ে কিংবদন্তী" বইটির "সাপের দুধ পান" শীর্ষক নিবন্ধে (পৃষ্ঠা - ১৬) উল্লিখিত আছে। আপনার পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করে জানা গেল, সাপ যেহেতু স্তন্যপায়ী নয় সরীসৃপ প্রাণী, তাই সাপ দুধ পরিপাক করতে পারে না, তাই সাপকে জোড় করে দুধ পান করালে, সাপ মারাও যেতে পারে। সাপের পরিপাক ক্রিয়ায় যে জলের প্রয়োজন তা সাপের মুখ খোলা ও বন্ধ করা এবং জলের (তরলের) গতিশীলতার জন্য পাকস্থলীতে পৌঁছায়। কিন্তু চুষে পান করতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা সঠিক। অর্থাৎ সাপ জল পান করে। কিছু কিছু প্রজাতির সাপ দেহত্বক দ্বারা জল শোষণ করে।

এই নিবন্ধে ৬ নং পয়েন্টে যা বলা হয়েছে তার অর্থ সাপের নলাকার দেহের দুই প্রান্তে দুটি মাথা হতে পারে না। সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে কোন কোন প্রজাতির সাপের দেহের দুই প্রান্তে মাথা হয় – সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতেই সাপের সকল প্রজাতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরা হয়েছে। ভ্রূণের গঠন ও বিকাশের সময় গড়মিলের জন্য প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম চরিত্র প্রকাশ পায়। মানুষের ক্ষেত্রে জোড়া বাচ্চা (যমজ নয়) – যেমন "গঙ্গা-যমুনা" এর উদাহরণ মানুষের স্বাভাবিক দেহ গঠনের ব্যতিক্রম। অবশ্যই ব্যতিক্রম সম্পর্কে জানা দরকার, না হলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তবে অচেনা-অজানা বহু ব্যতিক্রমের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক মন নিয়ে প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

(২) "সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি" নিবন্ধে –

(ক) "কেউটের কামড়ে বিষথলির ২/৩ অংশ ... কিন্তু চন্দ্রবোড়ার ... সবটুকু বিষ বেরিয়ে আসে।"

এই বক্তব্যটি উৎস মানুষ সংকলিত, "সাপ নিয়ে কিংবদন্তী" বইটির, "বিষাক্ত সাপের দংশন কৌশল" শীর্ষক নিবন্ধ। (পৃষ্ঠা - ৬২) থেকে গৃহীত।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই সাপ ঠিক মতন কামড়াতে পারে না, ফলে নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিষ নির্গত করতে পারে না।

(খ) "শিকার ধরার সময় সাপ বিষ দাঁত ব্যবহার করে না" এই বক্তব্যটি আংশিক ভুল। কারণ সাপের বিষ দাঁতের ব্যবহার সাপের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সাপ যখন বড় ধরণের শিকার ধরে, তখন শিকারকে নিস্তেজ(প্যারালাইজড) করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিষ প্রয়োগ করে – এসব কিছুই সাপের প্রতিবর্ত ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তথ্য সূত্র - wikipedia-org/wiki/snakebite এবং ডিগ্রী কোর্সের জুলজি বই।

wikipedia - 5 of 22 -
Pathophysiology

"Since envenomation is completely voluntary, all venomous snakes are capable of biting without injecting venom into their victim. Snakes may deliver such a dry bite rather than waste their venom on a creature too large for them to eat. However, the percentage of dry bites varies between species ..."

(৩) এই নিবন্ধে, "বিষ এর উপস্থিতি অনুযায়ী সাপের শ্রেণী বিভাগ" এর যে ছকটি ছাপা হয়েছে, তা দেখার ক্ষেত্রে, আপনার মতন আরও অনেকেরই ভ্রান্তি ঘটেছে। তীব্র বিষধর সাপের শ্রেণী বিভাগের মধ্যেই চন্দ্রবোড়া ও সকল সামুদ্রিক সাপ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, নথিভুক্ত সামুদ্রিক সাপের কামড়ের ৮০% বিষহীন হবার অন্যতম প্রধান কারণ সামুদ্রিক সাপের বিষদাঁতগুলি চোয়ালের শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

(৪) এই নিবন্ধে, "অ্যান্টি ভেনাম প্রয়োগের পূর্বে রোগীর যা ক্ষতি সাধন হয় তা সারানো সম্ভব হয় না" – এই বক্তব্যের অর্থ মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গের পৃথক পৃথকভাবে আঘাত সহ্য করার এক একটি সীমা আছে। যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক গঠন ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ক্ষতি সাধন বলতে ঐ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রমের কথা বলা হয়েছে। আপনার অভিজ্ঞতা উক্ত সীমার মধ্যকার অভিজ্ঞতা।

তথ্য সূত্র – wikipedia-org/wiki/snakebite 12 of 22
EPIDEMIOLOGY

"Antivenom is injected into the patient intervenously and works by binding to and neutralizing venom enzymes. It can not undo damage already caused by venom, so antivenom treatment should be sought as soon as possible ..."

আশা রাখি, পাঠকের পত্র ও সমীক্ষণ-এর প্রচেষ্টা, সমগ্র পাঠককূলকে, পত্র দ্বারা সমীক্ষণ-এর সমালোচনায় আগ্রহী করে তুলবে। চীরঞ্জীব বাবুর পত্র পাঠকদের ও "সমীক্ষণ" এর কাছে সেই দাবীই করছে। সমীক্ষণ-এর সম্পাদক মন্ডলী এ বিষয়ে চীরঞ্জীব বাবুর সঙ্গে সহমত প্রকাশ করছে।

ধন্যবাদান্তে

রিপোর্ট

জিন-পরিবর্তিত ধান চাষের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার দাবীতে আন্দোলন

"অপউন্নয়ন বিরোধী শিক্ষক ও বিজ্ঞানী" (Teachers & Scientist Against maldevelopment) বা TASAM এবং "একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ" (Form Against Monopolistic Aggression) বা FAMA নামক দুই বিজ্ঞান সংগঠন জিন-পরিবর্তিত ধান চাষের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার দাবীতে সাম্প্রতিক এক লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠন দুটির বক্তব্য 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'-এর নামে দেশের কৃষিক্ষেত্রকে বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। দেশের পুঁজিপতিরাও এই চক্রান্তের শরীক।

৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ঐ দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় "তাদের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য হল কৃষিকাজে ব্যবহৃত বীজ, কীটনাশক, জীবাণুনাশক, আগাছানাশক, এমনকি জলের বাজার দখল করা এবং চড়া দাম নির্ধারণ ব্যবস্থাকে হাতে নেওয়া এবং সরকারী বা আধাসরকারী গবেষণা পরিকাঠামো-গুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনা।" যৌথ বিবৃতিতে দাবী করা হয় – ১) একচেটিয়া সংস্থাগুলি পরিচালিত 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' খারিজ করতে হবে। ২) ভারতের বাজারে খাদ্য, বীজ এবং রসায়ন শিল্পের দৈত্যাকার বিশ্ব সংস্থাগুলির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। ৩) সরকারের টাকায় পরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন অবস্থাতেই প্রাইভেট সংস্থার স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দেওয়া যাবে না। ৪) স্থানীয় প্রজাতির বীজ সংরক্ষণে ও চাষে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। ৫) স্থানীয় কৃষকদের জানা দীর্ঘদিন প্রচলিত প্রায়োগিক ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশী প্রযুক্তি বিকশিত করার জন্য স্বাধীন গবেষণার উদ্যোগগুলিকে সাহায্য দিতে হবে সরকারকে।" উপরোক্ত দাবীগুলি নিয়ে এবং চুঁচূড়া গবেষণা কেন্দ্রে জিন-পরিবর্তিত ধান পরীক্ষা বন্ধ করার দাবীতে ১৪ই জানুয়ারী চুঁচূড়া অভিযানের সিদ্ধান্ত জানান হয়।

১৪ই জানুয়ারী ২০১১, বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যবৃন্দের ব্যাপক অংশগ্রহণে চুঁচূড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের সামনে সারা দিনব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং ঐ সংস্থার অধিকর্তার নিকট এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এরপর ১৬ই মার্চ ২০১১ একদল প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে জিন-পরিবর্তিত বীজের গবেষণা বন্ধের দাবীতে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে এই রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হয়। বিষয়টি নতুন সরকারের শিক্ষা ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আনা হয়। সরকারী মহল থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং এরজন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়। ঐ কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার জিন-পরিবর্তিত ধানের পরীক্ষামূলক চাষ নিষিদ্ধ করে। FAMA & TASAM-এর জন্য সাংগঠনিকভাবে সরকারকে অভিনন্দন জানায়।■

বন্যা এবং বহুমুখী নদী প্রকল্প

২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গের বা ২০০৬ সালে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল বাঁধ থেকে জল ছাড়ার দরুণই। পশ্চিমবঙ্গে এবছরের বন্যাও খুব মারাত্মক রূপ নিতে পারত। বৃষ্টি সেই সময় আরও চলতে থাকলে ডি ভি সি-কে আরও বেশী জল ছাড়তে হতো আর তাতে বন্যার তীব্রতা আরও বেড়ে যেত।

অপরপক্ষে নদী বাহিত পলি জমার কথা নদীর দুই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবর্তে জমা হচ্ছে বাঁধের জলাধারে - ফলে জমিগুলি যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার উর্বরা হয়ে উঠত সেটাও বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

তাহলে উপায় কি? বাঁধ দেবো না? নদীর জলের তীব্রতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবেনা? বহুমুখী নদী প্রকল্প গড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সারা পৃথিবী জুড়েই হয়েছে এবং একটা সময়ে এসে প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নদী, বাঁধ, বন্যা সবকিছু নিয়েই নতুন করে চিন্তাভাবনা করা দরকার। তার আগে পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করতে পারি তা হল –

১) নদী, খাল এবং বাঁধের জলাধারের জলের নাব্যতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত ড্রেজিং করা;

২) শহরের ঠিক বাইরে বা গ্রামের মধ্যে জলাধার বানানো এবং তার রক্ষনাবেক্ষণ।

৩) মাটির ক্ষয় রোধের জন্য গাছ লাগান।

তথ্যসূত্র ঃ

1. WCERT Social Science, Secondary level. 2. Down To Earth, Editorial Board 3. প্রচলিত লোক সঙ্গীত

আমতলার নার্সিংহোমে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু – আমাদের কি শেখায় ?

১৭ই জুন, শুক্রবার। রাত ১১টা। অসহ্য প্রসব যন্ত্রণা ওঠায় দিদিকে নিয়ে নার্সিংহোমে আসে মিঠুন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আমতলার মোড়ের রোজল্যান্ড নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ আলতাব ও তার পার্টনার ডাঃ জাকিরের সাথে ফোনে কথা বলে। এরপর দিদিকে স্যালাইন ও ইনজেক্শন দেওয়া হয়। রাত ১টা নাগাদ যন্ত্রণা কমে। তখনও গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়া মা-র শরীরে শিহরণ জাগায়। প্রসব না করিয়ে পেসেন্টকে ফেলে রাখা হয় পরদিন সকাল পর্যন্ত। সকাল ৭টায় ডাঃ হিমাংশু মিস্ত্রি পরীক্ষা করে দেখেন বাচ্চার বিটার সাউন্ড পাওয়া যাচ্চে না। তিনি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে দেন। সকাল ১২টায় রিপোর্টে জানা যায় শিশু মাতৃগর্ভে মৃত।

এই ঘটনার পর মিঠুন ও বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি, হইচই করে। খবর পেয়ে আমাদের কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় ঐ ঘটনার আগের দিন রাত ৯টায়, ৬ দিন ধরে নার্সিংহোমে থাকার পর বাচ্চা ও মা সম্পূর্ণ সুস্থ বলে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডাঃ হিমাংশু মিস্ত্রি ঐ রোগীকে অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করছেন। মিঠুন চেয়েছিল তাঁর দিদির নর্মাল ডেলিভারি হোক। শুক্রবার রাতে যখন দিদির প্রসব যন্ত্রণা ওঠে তখন নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ আলতাব নাকি বলেছেন "এই ঝড়ের রাতে ডাঃ মিস্ত্রি আসবেন না। সিজার হলে আসতে পারেন।" মিঠুন তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলে "যা ভাল হয় তাই করবেন।"

আমাদের কর্মীরা নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ আলতাবকে জিজ্ঞাসা করেন–

প্রশ্ন – আপনি কী ইনজেকশন ও ওষুধ দিয়েছিলেন ?

উত্তর – পলিবিয়ান ইনজেকশন ও র‍্যানটাক।

প্রশ্ন – আপনি জানেন এগুলি কি জাতীয় ওষুধ ?

উত্তর – র‍্যানটাক গ্যাসের আর পলিবিয়ান ভিটামিন।

প্রশ্ন – আপনি কি ওগুলো নিজের সিদ্ধান্তে দিয়েছেন ?

উত্তর – ফোনে ডাঃ মিস্ত্রির সাথে কথা বলা হয়। উনি ওগুলো দিতে বলেন।

প্রশ্ন – বেবির বিটার সাউন্ড না পাওয়ার মানে কী ?

উত্তর – বেবি হয় মারা গেছে, নয়ত উল্টে গেছে।

প্রশ্ন – অর্থাৎ বলা যায় না বেবি মারা গেছে ?

উত্তর – USG ছাড়া তা কখনওই বলা যায় না।

প্রশ্ন – আপনি তো পেসেন্টের আত্মীয়, ওরা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করেছে। এই অবস্থায় আপনাদের তো উচিৎ ছিল পেসেন্ট পার্টিকে সত্যটা জানানো। অন্য কোনও হাসপাতাল বা নাসিংহোমে সেই রাতে নিয়ে গেলে বাচ্চাটা তো বাঁচতেও পারত! রুগীর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আপনারা কি তার শিশুকে খুন করলেন না?

উত্তর – হ্যাঁ সেটা আমাদের উচিৎ ছিল। এটা আমাদের হয়ত, হয়ত কেন ভুলই হয়েছে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন তো আর কিছু করা যাবে না। এর জন্য আমি সবার হয়ে ক্ষমা চাইছি।

প্রশ্ন – আপনি ...

উত্তর – না, প্লিজ। আর কোনও প্রশ্ন করবেন না (বলে রুমের মধ্যে ঢুকে যায়। দরজা বন্ধ হয়ে যায়)।

অনুসন্ধানে জানা গেল ডা. জাকির ও তার বিজনেস পার্টনার কোন পাশ করা ডাক্তার নন, সম্পূর্ণ হাতুড়ে ডাক্তার। মিঠুন তার দিদির নর্মাল ডেলিভারি চেয়েছিল আর আলতাব ও ডা. মিস্ত্রি চেয়েছিল সিজার করতে, মোটা রোজগারের উদ্দেশ্যে। গ্যাস ও ভিটামিন ইনজেকশনে রোগীর প্রসব যন্ত্রণা কখনও কমতে পারে না। নিশ্চই এমন কোন ইনজেকশন বা ওষুধ দেওয়া হয় যাতে মায়ের প্রসব দ্বার সংকুচিত হয়ে প্রসব যন্ত্রণা কমিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল পরদিন সকালে ডা. মিস্ত্রি এসে সিজার করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় মাতৃগর্ভের শিশুটি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে কিনা তার জ্ঞান এই হাতুড়ে ডাক্তারদের ছিল না। পরদিন ইউ এস জি করার পর পেসেন্ট পার্টিকে বলা হয় ২৪ ঘন্টা আগে শিশুটি মারা গেছে। এই কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ ওইদিন রাত ১টা পর্যন্ত মা তার গর্ভস্থ শিশুর নড়াচড়া অনুভব করেছে। জাকির প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ায় মিঠুনরা শান্ত হয়ে যায়। অদৃষ্টের লিখন হিসাবে সব মেনে নেয়। এরপরেও কেউ নিশ্চই বলবেন না, এটা একটা সাধারণ মৃত্যু! এই আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর ঘৃণ্য চক্রান্তে একটি শিশুকে খুন করা নয়! বলতে পারেন – সমাজের বিবেক কোথায় গিয়ে দাঁড়ালে শিশুর খুনেও আবেগহীন থাকা যায়!

এই অবস্থায় মিঠুনেরা যদি চিৎকার করে বলে ওঠে "শুয়োরের ... খুনী আলতাব, খুনী ডা. মিস্ত্রি তোরা এই খুন করলি কেন তার জবাব দে।" মিথ্যা সভ্যতার দম্ভে আমরা নিশ্চই ওদের অন্তত ছোটলোক বলতে পারি না। এই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে এটাই মানবিকতার সোচ্চার প্রকাশ। এখানে আলতাব, জাকির, ডা. মিস্ত্রি এরা কেউ নিছক ব্যক্তি নয়। মুনাফাখোড়ী ব্যবস্থার এক একটা নগ্ন চেহারামাত্র। ■

বাদামতলার 'ভূত' পালালো

গত ২রা জুলাই সকালে বিজ্ঞান মনস্ক'র ঠাকুরপুকুর শাখায় একটি খবর আসে যে, ঠাকুরপুকুর সংলগ্ন বাদামতলার পালপাড়ায় একটি মেয়েকে ভূতে ধরা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সাথে সাথে আমাদের কর্মীরা প্রাথমিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ওই অঞ্চলে রওনা দেন। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায় যে একটি ১৮-১৯ বছর বয়সী মেয়ে মৌসুমী-র উপর তার প্রতিবেশী কৃষ্ণা নামক একজন মাঝবয়সী মহিলা ভূত চালান করেছে। এবং তার ফলে মেয়েটির বাবা-মা ও নিকট আত্মীয় স্বজনেরা চড়াও হয়ে মহিলাকে গালাগালি করা এবং মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে। বিপন্ন মহিলা এর ফলে বারে বারে থানায় ছুটে গেছেন। থানা আশ্বাস দেয় গায়ে হাত পড়লে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে।

কৃষ্ণাদেবীর বাড়ি গিয়ে জানা যায় যে তিনি ছেলে, মেয়ে-জামাই এবং তাদের ২ বছরের বাচ্চা নিয়ে ঐ বাড়িতে ভাড়া থাকেন। গত কালীপুজোর সময় কৃষ্ণাদেবীর পরিবারের লোকেরা বাজি ফাটাতে গিয়ে মৌসুমীদের বাড়িতেও বাজি ফেলে। তাতে সম্ভবতঃ কারও গায়ে বাজির আগুন লাগে। তাতে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি হয়। পরের দিন কৃষ্ণাদেবীরা মৌসুমীদের বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। তখনকার মত গোলমাল মিটলেও দীর্ঘমেয়াদী অসন্তোষের বীজ লুকিয়ে ছিল।

কিছুদিন পর থেকেই শোনা যায় যে মৌসুমীকে নাকি দু-একমাস অন্তর ভূতে ধরে। সেই সময় থেকেই মৌসুমীর আত্মীয়রা কৃষ্ণাদেবীকে মৌসুমী-র উপর ভূত চালানের অভিযোগ করতে থাকে। কৃষ্ণাদেবী জানান তিনি সব সময় আতঙ্কে থাকেন এবং ছেলে-মেয়ে জামাইকে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয় বলে তাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

বিকেলে ফের আমাদের কর্মীরা এলাকায় যান। প্রচুর মানুষ ঘিরে ধরে আমাদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। দেখা যায় কেউ কেউ ভূতে ধরা ও ভূত চালানের কথা বিশ্বাস করেন আবার কেউ কেউ মনে করেন মেয়েটিকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখানো দরকার। মৌসুমী-র মা-বাবাও খবর পেয়ে ওখানে এসে তাদের অভিযোগ জানান। তাঁরা বলেন যে কালীপূজোর পর থেকেই মাঝে মাঝে তাদের মেয়েকে ভূত ধরে। সেই সময় মেয়ের গায়ের জোর বেড়ে যায় এবং সে বারে বারে বলে "কৃষ্ণা আমায় পাঠিয়েছে, আমি প্রশান্ত (মেয়েটির জ্যাঠতুতো দাদা) ও মৌসুমী-কে খুন করবো।" শোনা যায় ১লা জুলাই নাকি মৌসুমী সাইকেল নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছে না। মৌসুমী-র মা-বাবা বলেন তারা মেয়েকে ডাক্তার দেখিয়েছে কিন্তু ডাক্তার বলেছে মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ। ওঝার কাছে যাওয়ায় সে বলেছে – ভূতটা ঠিক কথাই বলছে। কৃষ্ণাদেবীই এই ভূত চালান করেছে।

মৌসুমীর সাথে কথা বলে জানা যায় সে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয় মাথায় কে যেন মারছে। সাইকেল চালাতে গিয়ে মনে হয় কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তবে তার কিছুই মনে নেই। কাউকে ভূতে ধরতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে হ্যাঁ সে দেখেছে। কথা বলার সময় মেয়েটি শান্ত ছিল এবং অস্বাভাবিক কোন আচরণ দেখা যায় নি। সাইকেল নিয়ে সে কোথায় গেছিল জিজ্ঞাসা করায় জানায় কাছাকাছি। আমাদের কর্মীরা লক্ষ্য করেন যে কথা বলার সময় মেয়ের বদলে মা-ই বেশি কথা বলছেন।

আমাদের কর্মীরা তখন বলেন ভূত বলে কিছু হয় না, ভূতে ধরা বা ভূত চালান সব আজগুবি, সাজানো কথা। গ্রাম বাংলায় ভূতে ধরা বলতে যা বোঝায় তা হয় হিস্টিরিয়া বা আতঙ্ক বা মৃগী রোগ অথবা গোটাটাই সাজানো এবং কোন প্রতিশোধ নেওয়ার অভিলাষে অভিনয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় কারণটি অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত অভিনয় বলেই আমাদের মনে হচ্ছে। মেয়ে ও তার মা-কে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে আমাদের এক কর্মী তাদের বলে – এভাবে ভূত ধরার কথা প্রচার করলে কিন্তু মৌসুমী-র বিয়ে দিতে আপনাদের অসুবিধা হবে। এ কথা শুনে মা-কে বেশ বিব্রত হতে দেখে আমাদের কর্মীরা ঘটনার কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যান।

এরপর ঘটনার দ্রুত নিস্পত্তি হয়। মৌসুমীর বাড়ির লোকেরা পরদিন সকালে কৃষ্ণাদেবীর বাড়িতে এসে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়।

সবশেষে একটা কথা বলার আছে – রাতারাতি ভূত ভেগে যাওয়ায় ওই অঞ্চলের মানুষের মন থেকে কি কুসংস্কার দূর হয়ে গেল ? সত্যিই কি ওঝা-গুণিনদের ব্যবসাপত্তর লাটে উঠবে? উত্তর হল – 'না'। মানুষ আবারও ভূত বিশ্বাস করবে, ওঝা-গুণিনদের ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। আসলে যতদিন না পাল্টা সংস্কৃতি, অর্থাৎ মানুষে মানুষে ঘৃণা নয় ভালোবাসার সংস্কৃতি, মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার সংস্কৃতি, মানুষে মানুষে শোষণ নয় শোষণমুক্ত করার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই ভূত-ওঝা-গুণিনরা সমাজে দাঁপিয়ে বেড়াবে।■

সুন্দরবনের পাথর প্রতিমায় বিজ্ঞানমনস্ক

এই বছরের (২০১১) ১৬ই এপ্রিল, সুন্দরবন অঞ্চলের পাথর প্রতিমা ব্লকের দুর্গাগোবিন্দপুর জনকল্যাণ সমিতির আমন্ত্রণে বিজ্ঞান মনস্কর কর্মীরা ওই অঞ্চলে উপস্থিত হয়। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে জনকল্যাণ সমিতি দীর্ঘ ৫ দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তার চতুর্থ দিনে বিজ্ঞান মনস্ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিজ্ঞান মনস্কতার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সংগঠন হিসাবে বিজ্ঞান মনস্ক বরাবরই পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটে গেছে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য ছাড়াও মাত্র দুবছর আগে আয়লার তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া সুন্দরবন অঞ্চল কি ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তা দেখার একটা উদ্দেশ্য ছিল।

১৬ তারিখ সন্ধ্যাবেলা সেদিনকার অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বিজ্ঞান মনস্ক'র হাতে। অনুষ্ঠান শুরু হয় 'খাদ্যে ভেজাল' প্রদর্শনের মাধ্যমে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তাতে কি ভাবে ভেজাল মেশানো হয় তা হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখানো হয়। এই প্রদর্শনের পাশাপাশি বক্তব্য রাখা হয় যে – খাদ্যে ভেজাল মেশানো হয় অতিরিক্ত মুনাফার স্বার্থে এবং যারা ভেজাল মেশায় তারাও ভেজালের প্রভাব থেকে বঞ্চিত হয় না। যে দুধে জল মেশায় সেও ভেজাল তেল খায়, যে তেলে ভেজাল খায় সেও অন্য কিছুতে ভেজাল খায় ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে বলা হয় যে সরকারী যা যা নিয়ম আছে, ভেজাল রোধ করার জন্য তা বলবৎ করার জন্য এক গণ আন্দোলন প্রয়োজন।

এর পরে আরেকটি বিজ্ঞান সংগঠন 'যুক্তিবাদী'-র পক্ষ থেকে অলৌকিক নয় লৌকিক শীর্ষকে বিভিন্ন যুক্তিবাদী প্রদর্শন করা হয়। মন্ত্রপূত জল দিয়ে জন্ডিস সারানো, মরিচ (লঙ্কা) বাবার লঙ্কা পোড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন বিজ্ঞানের খেলা দেখানোর মাধ্যমে বিভিন্ন ভন্ড সাধু-বাবাজীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা করা হয়।

এর পরবর্তীতে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে 'নদী বাঁধ পরিকল্পনা'ও 'জলসংকটের আড়ালে' এই দুই শীর্ষকে বক্তব্য রাখা হয়। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে নদী বাঁধ কিরকম হওয়া উচিত তা এই বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। 'জলসংকট'-এর কৃত্রিমতাকে উন্মোচন করার পাশাপাশি সমুদ্রের জলকে যে লবণমুক্ত করে পানীয় যোগ্য করা সম্ভব এবং সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাও বলা হয় এই বক্তব্যে। বক্তব্যের পাশাপাশি প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রের প্রদর্শন বক্তব্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

এর পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিলো বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে প্রগতিশীল গানের এক গীতি আলেখ্য। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে নিপীড়ন হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংস্কৃতিকে তুলে ধরার তাগিদে যে গান রচনা হয়েছে তা এই গীতি আলেখ্যর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে।

এর পরে 'যুক্তিবাদী' সংগঠনের পক্ষ থেকে সাপের উপরে একটি সিনেমা প্রদর্শিত হয়। একজন সর্প বিশারদ সাপ সম্বন্ধে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণাকে তুলে ধরে তার পেছনের আসল কারণগুলি ব্যক্ত করেন। সুন্দরবন অঞ্চলে বিষাক্ত সাপের বেশ উপদ্রব আছে এবং এই সিনেমায় সেই সকল বিষাক্ত সাপের প্রদর্শনও করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়।

সেদিনকার অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে 'ভোরাই' নাট্যগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেশিত 'কালবেলার বাঁশী' নাটকের মাধ্যমে। এই নাটকটির অভিনয়ের মান বেশ উচ্চমানের ছিল। ও হেনরীর গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত নাটকটি দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়।

পাথর প্রতিমার এই অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান মনস্ক'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সার্থক করার প্রয়াসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এছাড়া আয়লা বিধ্বস্ত পাথর প্রতিমা যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তা সত্যিই বিজ্ঞান মনস্ককে অনুপ্রেরণা জোগাবে। ■

"... বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্যদেশের পন্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির গতি, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পন্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন না। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরুপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পন্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞানপ্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।"

– মেঘনাদ সাহা

মেঘনাদ রচনা সংকলন
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
'সবই ব্যাদে আছে' রচনা থেকে উদ্ধৃত
ভারতবর্ষ, ২৭ বর্ষ, পৃ ৪০৭, ফাল্গুন ১৩৪৬ : ইং ১৯৪০

শ্রীরামপুরে বিজ্ঞান মনস্ক'র সভা

গত ২৪শে এপ্রিল, হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে, স্থানীয় অরুণোদয় ক্লাবের আমন্ত্রণে বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে একটি যুক্তিবাদী প্রদর্শনীর মাধ্যমে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা দূর করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত জনতার কাছে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানান হয়। পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে মানুষের ক্রিয়াকলাপের জন্য এই সম্পর্কে বলা হয় যে প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত কখনও এরকম ছিল না, সময়ের সাথে সাথে তার নানা পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে থেকেই এই পরিবর্তন চলছে। যুগে যুগে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে বদল ঘটেছে, আবার নতুনভাবে প্রাকৃতিক সাম্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এক গতীয় সাম্যের মধ্য দিয়ে চলেছে।

অলৌকিক বলে সাধারণের কাছে পরিচিত বহু ঘটনাকে খেলার আকারে প্রদর্শন করা হয় এবং এগুলি কিভাবে হয় তার বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। কর্মীরা ব্যাখ্যায় বলেন এই পৃথিবীতে তথা এই মহাবিশ্বে ঘটে চলা প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোন না কোন নির্দিষ্ট কারণ আছে এবং কোন ঘটনাই অলৌকিক নয় বা দৈব উপায়ে ঘটে না। বর্তমানে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চালু আছে তা সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যার ফলে সমাধানের উপায় না পেয়ে মানুষ বেশি বেশি করে অদৃষ্ট, ভাগ্য, ভগবান ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শুধুমাত্র প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার মানুষের মনের অন্ধকার দূর করতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে এবং প্রতিটি সমস্যার মূল খুঁজে তাকে উৎপাটনের কাজে হাত লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতার মধ্যে সমীক্ষণ সংগ্রহের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মত। অল্প সময়ের মধ্যে সব সমীক্ষণ বিক্রি হয়ে যায়। উদ্যোক্তাদের আতিথেয়তা বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীদের মুগ্ধ করেছে। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী ৪৭, বিবেকানন্দ সরণী, পূর্ব বড়িশা, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com